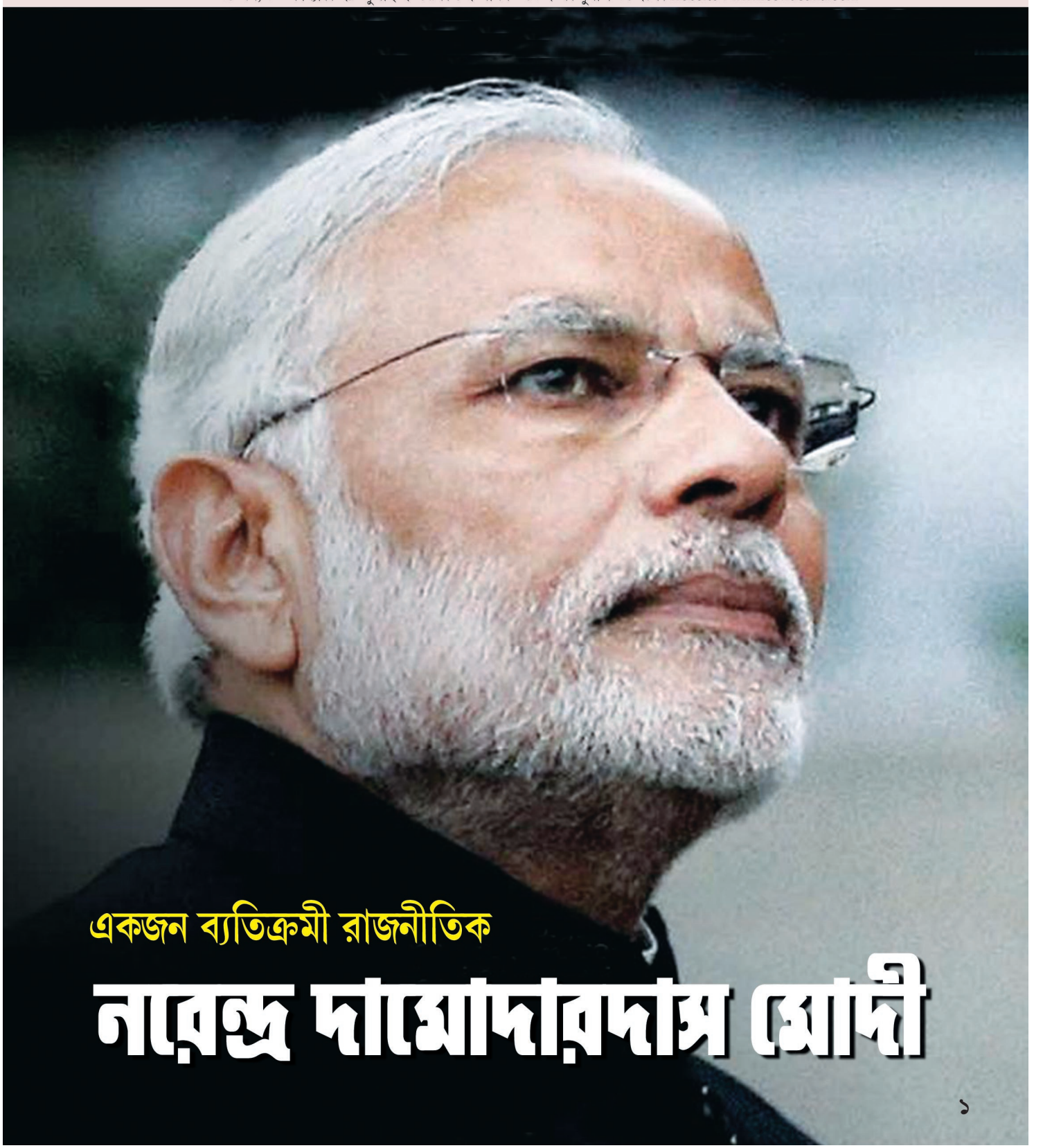
দাম : বারো টাকা

মোদীর প্রশাসনিক মন্ত্র
'ন্যূনতম সরকার
সর্বাধিক সুশাসন'
— পৃঃ ২৬

স্বস্তিকা

গোধরা কাণ্ডের
নেপথ্যে ছিল
ষড়যন্ত্র
— পৃঃ ৩৮

৭১ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ২৯ জুলাই ২০১৯।। ১২ শ্রাবণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিক

নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ১২ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৯ জুলাই - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে ভারতে সক্রিয় বাংলাদেশি দালালরা ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : একুশে জুলাই ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

গান্ধী পরিবারের পারিবারিক নাটক ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষতি করছে ▯ চেতন ভগত ▯ ৮

ছদ্মবেশী রাজনৈতিক নেতারা সংবিধানের দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিনাশের দিকে নিয়ে চলেছে ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১১

মব লিনচিং সরকারকে বদনাম করার এক অপচেষ্টা ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ১৩

চিকিৎসকদের ওপর হামলা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয় ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৫

নুসরতের বিরুদ্ধে ইসলামি ফতোয়া ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ১৬

নতুন ভারতে বন্দে মাতরমের নবরূপ 'জয় শ্রীরাম' ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৭

একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিক ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

মোদীর প্রশাসনিক মন্ত্র 'ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক সুশাসন' ▯ সুজিত রায় ▯ ২৬

মোদী সরকারের সাফল্য বিস্ময়কর ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৮

সংবাদমাধ্যমের বিষনজরে মোদী ▯ ৩০

'শিবাখ্যা'— দুর্গারই এক নাম ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ৩১

কম্বোডিয়ায় হিন্দু দেব-দেবী ▯ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩২

হারিয়ে যাচ্ছে পরম্পরাগত দেওয়ালচিত্র ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩৩

গল্প : পার্থিব-অপার্থিব ▯ বরুণ দত্ত ▯ ৩৫

গোধরাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল ষড়যন্ত্র ▯ ৩৮

আর এক নরেন্দ্র— নরেন্দ্র নাম্বার টু ▯ অঞ্জন মহাপাত্র ▯ ৪১

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ ছিলেন ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ নবাঙ্কুর : ৪৪-৪৫ ▯ উবাচ : ৪৬ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯

প্রকাশিত হবে
৫ আগস্ট
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ আগস্ট
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চন্দ্রযান - ২

শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান -২ রওনা দিয়েছে চাঁদের দিকে। ইসরোর বিজ্ঞানীদের এই অভাবনীয় সাফল্যে উত্তাল সারা দেশ। বস্তুত, মহাকাশ চর্চায় মোদী সরকারের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী চন্দ্রযানের সাফল্যের পথ যে অনেকাংশে প্রশস্ত করেছে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় চন্দ্রযান-২। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

ইদানীং বিভিন্ন মহলে কান পাতিলেই আকছার একটি আলোচনা শুনা যায়। আলোচনাটি হইল এই যে, অটলবিহারী বাজপেয়ী, না নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী—প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাহার কৃতিত্ব অধিক? এইরকম একটি আলোচনা নিরর্থক। কারণ, দুইজনেরই কর্মের বিচার করিতে হইবে তাহাদের সমসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। দেখিতে হইবে, তাঁহাদের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে সময়েরআহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারা উপযুক্ত ভূমিকা পালন করিতে পারিয়াছেন কিনা। যদি অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদীর কার্যপদ্ধতি বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, দুইজনই সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়া যথাযথ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে, বাজপেয়ীর সময়কালের সহিত বর্তমানের অনেক পরিস্থিতিগত পার্থক্যও রহিয়াছে। কাজেই যাঁহারা আজ অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর তুলনা করিতে বসিয়াছেন, বলিতেই হইতেছে, তাঁহারা একটি অকারণ এবং অনর্থক তুলনা করিতেছেন। অটলবিহারীর কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা যেমন করিতে হইবে তাঁহার সমসময়ের আলোয়, তেমনই নরেন্দ্র মোদীর কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করিতে হইবে বর্তমানের মাপকাঠিতে। তবু, এই দুই ব্যক্তিত্বকে লইয়া আলোচনা হইবেই। কারণ ভারতের সংসদীয় রাজনীতির সত্তর বছরের ইতিহাসে প্রথম এই দুই প্রথম জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করিয়াছেন।

অটলবিহারীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালের সময়সীমা ছিল পাঁচ বৎসর। নরেন্দ্র মোদী পাঁচ বৎসরের সময়সীমা অতিক্রান্ত করিয়া পুনরায় বিপুল জনাদেশ লইয়া দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করিয়াছেন। নরেন্দ্র মোদীর প্রথম পাঁচ বৎসরের প্রধানমন্ত্রিত্ব কাল অবশ্যই একজন দৃঢ়চেতা, নীতিনিষ্ঠ, সাহসী শাসকের সময়কাল হিসাবেই চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকাল সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। তাহা পর্যালোচনা করিবার সময় এখনো হয় নাই। কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরের শাসনকাল পর্যালোচনা করিয়া ইহা নিশ্চিতভাবে বলিয়া দেওয়া যায় যে, দ্বিতীয় দফাতে আমরা নরেন্দ্র মোদীর বহু সাহসী সিদ্ধান্ত এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের সাক্ষী হইয়া থাকিব। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার প্রথম পাঁচ বৎসরের শাসনকালে তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধকরণের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে এ এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। মুসলমান মৌলবাদীদের মন জুগাইয়া চলিতে যখন সবকয়টি রাজনৈতিক দলই ব্যস্ত, তখন তোষণের রাজনীতির পথে না হাঁটিয়া নির্যাতিতা, অত্যাচারিতা মুসলমান নারীদের স্বার্থরক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ চির ভাস্বর হইয়াই থাকিবে। নরেন্দ্র মোদীই হইতেছেন সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তিনি নিছক জনপ্রিয়তার স্রোতে গা না ভাসাইয়া কালোটাকার সমান্তরাল অর্থনীতি বন্ধ করিতে নোটবন্দির মতো সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি বাহিনী ভারতীয় জওয়ানদের উপর আঘাত করিলে, তাঁহার নির্দেশেই ভারতীয় সেনাবাহিনী সমুচিত জবাব দিয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই চীনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া ভারত বুঝাইয়া দিয়াছে, মুখের মতো জবাব এই দেশের সরকারও দিতে জানে। তাঁহার প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমনই পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছেও সম্ভ্রম এবং সমীহ আদায় করিয়া লইয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে।

মানিতেই হইবে নরেন্দ্র মোদী একজন ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক চরিত্র। তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদ হইতে শুরু করিয়া—সবক্ষেত্রেই তাঁহার এই সাহসী এবং ব্যতিক্রমী চেহারটি আমরা দেখিয়াছি। অনেকেই দক্ষ রাজনীতিক হন। কিন্তু ব্যতিক্রমী হন না। নরেন্দ্র মোদী একই সঙ্গে দক্ষ এবং ব্যতিক্রমী। রাজনীতিবিদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তিনি এখন রাষ্ট্রনেতার চরিত্রে উত্তীর্ণ।

সুভাষিতম্

গুশব্দান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দান্নিরোধকঃ।

অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে।। (শ্রীশ্রীগুরুগীতা/২০)

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ নিরোধক। অন্ধকার বা অজ্ঞানকে যিনি নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনাশ করেন, তাঁকেই 'গুরু' বলা হয়।

প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে ভারতে সক্রিয় বাংলাদেশি দালালরা

বিশ্বামিত্র-র

কলম

বাংলাদেশের প্রিয়া সাহার নাম কিছুদিন আগেও সেভাবে কেউ জানতেন না। রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োর জন্য। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলছেন যে তাঁর দেশ বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বেঁচে থাকার অধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি ট্রাম্পকে এও বলেন, মুসলমান মৌলবাদীরা তাঁর জমি কেড়ে নিয়েছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, কোনও বিচার পাওয়া যায়নি সরকারের থেকে, মুসলমান মৌলবাদীরা রাজনৈতিক আশ্রয়ও পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে প্রিয়া আরও বলেন ট্রাম্পকে যে, ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ বাংলাদেশ ছাড়া হয়েছে। এখনও যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ সংখ্যালঘু আছে, তাঁরাও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছেন।

জানা গিয়েছে গত ১৬ থেকে ১৮ জুলাই ওয়াশিংটনে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে দ্বিতীয় সরকারি সম্মেলন উপলক্ষ্যে আহূত হয়ে ট্রাম্পকে এই কথাগুলো বলেন প্রিয়া, এবং বাংলাদেশে নিরাপত্তার চূড়ান্ত অভাব বোধ করা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষায় আমেরিকাকে এগিয়ে আসার কাতর আহ্বানও জানান। সর্বসাকুল্যে এক মিনিটেরও নয়, ৫৩ সেকেন্ডের একটা ভিডিও তা নিয়ে এপার ওপার দু' বঙ্গই উত্তাল। প্রিয়ার একটি পোশাকি পরিচয় আছে, তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা মঞ্চ 'বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'-এর সংগঠন সম্পাদক।

প্রিয়া সাহা নতুন কিছু বলেননি। বাংলাদেশে হিন্দু-সহ বাদবাকি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন, তা কমবেশি সকলেরই জানা। অনেকের ধারণা আছে যে খালেদা জিয়া হলেন সাম্প্রদায়িক মুখ, আর শেখ হাসিনা উদার মুখ। একথা ঠিক যে, বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লিবারেল মানুষ আছেন, যাঁরা আন্তরিকভাবেই ভারত-বন্ধু, তাঁরা খালেদা জিয়ার পাকপন্থী মনোভাব, মৌলবাদী নীতির জন্য আওয়ামি লিগকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাক-অনুসারী, ক্ষমতায় যারাই অসুক না কেন, মৌলবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতেই হবে। মৌলবাদীদের হাতে ওই দু'দেশের সেনার নিয়ন্ত্রণ, সেই সূত্রে রাজনীতিরও।



ট্রাম্পের সামনে বর্ণনা দিচ্ছেন প্রিয়া সাহা।

ফলে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে পাকিস্তান যেমন দেশের সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক, বাংলাদেশও তেমন পূর্বপ্রান্তে ভারতের জন্য বিপদ সংকেত। একটা কথা মনে রাখুন, মৌলবাদীদের সমর্থন না পেলে শেখ হাসিনা তথাকথিত বিপুল 'জনাদেশ' নিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারতেন না। ফলে হিন্দুরা যে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানে বাস করছেন, বাংলাদেশেও তাঁদের একই শোচনীয় পরিস্থিতি।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে হিন্দুরা নিপীড়িত, মা-বোনেরা লাঞ্ছিত- ধর্ষিত, প্রাণের ভয় এঁদের অধিকাংশ ভারতে শরণার্থী হিসাবে পালিয়ে আসতেও বাধ্য হচ্ছেন। তথাগত রায়, বিমল প্রামাণিক, মোহিত রায়-রা এই বিষয়ে বহুদিন ধরে সরব। মোহিত রায়ের ক্যান্স (ক্যাম্পেন এগেইনস্ট অ্যাট্রোসিটিস অন মাইনোরিটিস ইন বেঙ্গল) বাংলাদেশের হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় অনেকদিন থেকেই কাজ করে আসছে। এঁদের সৌজন্যে বাংলাদেশের হিন্দুরা কতটা ভয়াবহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন সেকথা সবাই জেনে গেছেন। কিন্তু গোল বেঁধেছে সাম্প্রতিক কালে। 'বাঙ্গালি বাঙ্গালি ভাই ভাই, বাংলায় আরবি সংস্কৃতি চাই' ধুয়ো তুলে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদীর জন্ম হয়েছে এপার বাঙ্গলায়, এরা হিন্দু পদবিধারী হলেও আসলে মুসলমানদের পদলেহন করাই এদের মূল কাজ। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এদেশের কমিউনিস্ট দলের কিছু লোক, বাংলাদেশপ্রেমী সাজতে গিয়ে যারা সেদেশের মৌলবাদকে চিরকাল প্রত্যক্ষ সমর্থন করে এসেছে, এদের এখন ভারী রাগ প্রিয়া সাহার ওপর।

প্রিয়া কেন এমন কথা বললেন? তাঁর বলা উচিত ছিল, বাংলাদেশে হিন্দুরা কী সুখে আছে! বাংলাদেশ সবধর্মের তীর্থক্ষেত্র, বাংলাদেশই বাঙ্গালিদের একমাত্র 'হোমল্যান্ড', আরও স্পষ্ট করা বলতে গেলে 'ইন্ডিয়া'য় অত্যাচারিত 'বাঙ্গালি'রা বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে 'রিপাবলিক অব বেঙ্গল' গড়ে তুলুন ইত্যাদি। 'রিপাবলিক অব বেঙ্গল'-এর আশঙ্কার কথা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, তবে রাজনৈতিক ভাবে। এর বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন যাবৎ বহাল। এক বাঙ্গালি হিন্দুনামধারী তথ্যচিত্র নির্মাতা অনেকদিন ধরে বাংলাদেশের হয়ে ওকালতি করছেন। সাম্প্রতিক ঘটনায় তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাখ্যা হলো শেখ হাসিনার নীতি যেহেতু চীন-ঘেঁষা', তাই হাসিনাকে শিক্ষা দিতে আমেরিকা প্রিয়া সাহার ঘটনা 'সাজিয়েছে'। আবার আরেক ফেসবুক পোস্টে তিনি বাংলাদেশকে মহৎ-উদার দেখিয়েছেন। এই বিদেশি রাষ্ট্রের দালালদের মুখোশ খুলে দিয়েছে প্রিয়া সাহার ঘটনা। বাংলাদেশে এরপর প্রিয়ার ওপর নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রীয় নির্মমতার খাঁড়া নেমে আসবে। বৃহত্তর ধান্দায় তখনও এই দালালরা বিদেশি খুনিদের গুণ গাইবে। ভারতের উচিত প্রিয়া সাহার পাশে দাঁড়ানো এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের অধিকার সুরক্ষিত করা। ■

একুশে জুলাই

মাননীয় দিদি,

মনটা খুব খারাপ। সেদিন একদম মন ভরল না। জানি, আপনি মুখে না প্রকাশ করলেও আপনারও মন খারাপ, মাথায় দুশ্চিন্তা।

আসলে তো এ কোনও দিন মাত্র নয়, বঙ্গ রাজনীতির এক চরিত্রের নাম— একুশে জুলাই।

এই একুশে অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। বঙ্গ রাজনীতির অনেক ওঠাপড়া দেখেছে সে। এই একুশে দেখেছে শূন্য থেকে তৃণমূলের অনেক হয়ে ওঠা। এই একুশে দেখেছে এক সাংসদের দলকে একক শক্তিতে রাজ্যের ক্ষমতায় বসতে, সব থেকে বড়ো কথা আপনার জননেত্রী হয়ে ওঠা দেখেছে সে।

অনেক কিছু দেখিয়েছেও এই একুশে। ১৯৯৩ সালের পর থেকে ফি বছর একুশে জুলাই পালন করে চলেছেন আপনি। তখন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মও হয়নি। সেই বাম আমলে কখনও যুব কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে, কখনও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে আপনার ডাকে রাজ্যের মানুষ জড়ো হয়েছেন শহিদ দিবসে। এই মঞ্চে কখনও জোট শরিক বিজেপি, কখনও কংগ্রেস নেতাদের দেখা গেলেও বরাবরের মধ্যমণি আপনি মমতা। আর সেই মমতাই বারবার হারিয়েছেন মমতাকে। প্রতিবারের ভিড় টপকে গিয়েছে আগের বারের সমাবেশকে। এই একুশে জুলাই জানে, কীভাবে একটু একটু করে বাম দুর্গে ধস নেমেছে, কীভাবে ঘাসফুলের গোড়া শক্ত হয়েছে।

এবার কিন্তু উল্টো পুরাণ। এও এক রেকর্ড। মমতা আপনার কাছেই হেরে গেলেন মমতা। এই প্রথমবার একুশের সমাবেশে উপস্থিতি কমতির দিকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে ২০১১ সালে বিজয় দিবস ও শহিদ দিবস মিলিয়ে ব্রিগেডে সমাবেশ করলেও বাকি বছরগুলিতে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই মঞ্চ বেঁধেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই সব সমাবেশ যাঁরা ফি বছর দেখেছেন তাঁরা জানেন এমনটা আগে দেখা যায়নি। প্রতি বছরের ভিড় বৃদ্ধির দৃশ্য তো ছিলই না বরং, খোদ ধর্মতলা চত্বরেই ভিড় কখনও জমাট বাঁধেনি। মানুষের কালো মাথার ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যমান হয়েছে অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকা কালো পিচের রাস্তা। দেখা গিয়েছে না জমা ভিড়ের মাঝখান দিয়ে অনায়াসে চলছে মোটরসাইকেল। আর সেটা তখন, যখন খোদ আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখছেন।

পুলিশের কর্তারাও আড়ালে আবডালে স্বীকার করে নিয়েছেন কমতি ভিড়ের কথা। তবে দিদি, আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে প্রায় ২০ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়েছে এদিন। কিন্তু আঁখো দেখা অভিজ্ঞতা বলছে, এদিনের সমাবেশে, টু-মিলিয়ন সংখ্যাটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

সেটা যে হয়নি তা তো তৃণমূলনেত্রী আপনার বক্তৃতাতেই স্পষ্ট হয়েছে। শুরু থেকেই আপনি যেন সাফাই দিতে চাইলেন। এদিন অবস্থা বুঝে আগেভাগে সভায় চলে আসেন।

সাধারণত আপনি সমাবেশ শুরুর অনেকটা পরে সভাস্থলে আসেন এবং বক্তৃতা শুরু করেন দুপুর একটার পরে। এদিন সেখানে পৌনে একটাতেই আপনার বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়। দেড়টা বাজার পরে পরেই সমাবেশের সমাপ্তি।

আপনি শুরুতেই বলেন, যখন বাড়ি থেকে আসছেন তখন নাকি রেড রোডে লাখ দু'য়েক মানুষের জমায়েত ছিল। ব্রিগেডে নাকি আলাদা একটা সমাবেশ হচ্ছে বলে মনে হয়েছে আপনার। কিন্তু তাঁরা কেন সভাস্থলে না এসে রেড রোডে রইলেন সে প্রশ্নের উত্তর দেননি আপনি। পরে আবার বললেন, অনেকেই নাকি ময়দানে বসে মাইকে বক্তৃতা শুনছেন। এমনকী বক্তৃতার শুরুতেই আপনি বলে দেন আগামী এক ঘণ্টায় কিছু ঘোষণা করবেন আর সেটা না শুনে কেউ যেন চলে না যায়।

এমন বলার কারণও ছিল। এদিন সমাবেশের গোটা সময়টাই নড়াচড়া করেছে ভিড়। জমার ব্যাপারটাই ছিল না। আপনি যখন বলতে শুরু করেছেন তখনই দেখা যাচ্ছে দলে দলে মানুষ উঠে পড়েছেন। বিজেপির উত্থানে তৃণমূলের যে সাংগঠনিক শক্তি কমেছে, লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফল যে রাজনৈতিক শক্তি কমিয়েছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এদিনের পাতলা ভিড়।

এতেই মন খারাপ দিদি। চিন্তা হচ্ছে। এই একুশে দেখিয়েছে কীভাবে আপনার শক্তি বেড়েছে। আবার এই একুশেই দেখাতে শুরু করল কীভাবে আপনার শক্তি এবং জনপ্রিয়তা কমছে।

—সুন্দর মৌলিক

গান্ধী পরিবারের পারিবারিক নাটক ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষতি করছে

অতিথি কলম



চেতন ভগত

না না কংগ্রেস মারা যায়নি, দলটি কোমায় অবস্থান করছে। সেই অর্থে এটি হয়তো জীবিত নয় কিন্তু কবে যে সক্ষম পুনর্জীবন ফিরে পাবে সেটাও বুক ঠুকে বলা যাচ্ছে না। এমন কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে মহান রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রতিক্রিয়ায়। তাঁর পদত্যাগপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি কিছুটা পরাজয়জনিত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেও পরের কিছু পঙ্‌ক্তি থেকেই যথানিয়মে বাকিটা অন্যকে দোষারোপ করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে তিনি কতটা দায়বদ্ধভাবে পদত্যাগ করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

সত্যিই এই পদত্যাগপত্রকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিলে এতদিনে একজন উপযুক্ত সভাপতি নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া নিশ্চয় শুরু হতো। মনে হচ্ছে পদত্যাগটি যেন আক্ষরিক অর্থে কোনো পদ থেকে ছুটি নেওয়া হয়েছে, ক্ষমতা থেকে নয়। এই কায়দাটা গান্ধী পরিবারের সবিশেষ রপ্ত আছে। তারা এর বিপুল প্রয়োগও করে দেখিয়েছে। এই কারবারে গান্ধীদের Congress Chief Exceutive Officer (CEO) অর্থাৎ প্রধান কার্যাধ্যক্ষের নামাঙ্কিত কোনো কার্ড লাগে না। দশ বছর ধরে অন্তরালে থেকে শিখণ্ডী মনমোহন সিংহকে টেকনিক্যাল প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে তারা দিব্যি ইচ্ছে মতো দেশ চালিয়ে গেছে।

পদত্যাগের পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিকল্প কোনো নেতাকে কংগ্রেস সভাপতির পদে বিবেচনাই করা হচ্ছে না। এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, তারা মঞ্চের পাশ থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন যে রাহুলবাবুর ছেড়ে যাওয়া পদে বসবার হিম্মত অন্য কোনো কংগ্রেস নেতা দেখাচ্ছেন কিনা। যদি কোনো বুদ্ধু সেই চেষ্টা করে পরিবারের কালো তালিকায় তার নাম বরাবরের জন্য উঠে যাবে। কেননা সে পরিবারের পক্ষে সম্ভাব্য বিপজ্জনক ব্যক্তি। সে চিরকালের জন্য সাইড লাইনের বাইরে চলে যাবে। আমার একটা হাল্কা গল্প এই সূত্রে মনে পড়ে গেল। একজন অভিভাবক তাঁর বাচ্চাদের বললেন যাও কিছু বলব না তোমরা এখন টিভি দেখতে পারো। তিনি বাড়ি থেকে একটু বেরোচ্ছিলেন। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে জানলা দিয়ে নজর রাখছিলেন কে প্রথম টিভিটা চালায়, ভবিষ্যতে তাকে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

> রাজনীতিতে বিরোধী দলের কর্তব্য পালনটা আবশ্যিক। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কোনো প্রতিভাবান মানুষ এসে দায়ভার নিন। অচলাবস্থা কাটান। শুধুমাত্র একটি পদ থেকে সরে গেলে হবে না কঠোর বাস্তবকে মেনে নিয়ে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিসরই যোগ্যতরকে ছাড়তে হবে।

এতদূর তো মজা হিসেবে ঠিকই আছে যদি এর কুফল আমাদের দেশের ভবিষ্যতের ওপর না পড়ে। গান্ধী পরিবার কেবলমাত্র তাদের নিজেদের কথাই ভাবছে। শুধুমাত্র নিজেদের কথাই তাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা। তারা দেশের কথা দূরস্থান, কংগ্রেস দলের সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। তারা আশা করছে যে হাতে-পায়ে ধরে অনুকম্পা ভিক্ষে করে সভাপতিকে পদে ফিরিয়ে আনতে দল হামলে পড়বে। মনে হয় তারা এমনটাও ভাবছে রাজনীতির হাওয়ার গতিপথ বদল হবে। অনুকূল বাতাসে ভারতের মানুষ তাদের মন বদল করে আবার তাদের অভ্যর্থনা করে ফিরিয়ে আনবে। ভাববার কারণ এমন বহু অতীত রেকর্ড আছে।

অবশ্যই, ভবিষ্যৎ কেউই আগাম বলতে পারে না। কিন্তু গান্ধী পরিবারের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিশ্চয় আছে। সারা পৃথিবীতে বহাল থাকা বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের দলের প্রয়োজন সকলে মেনে নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী পরিবার কিন্তু প্রতি দিন দেশবাসীর কাছে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। তবে, এই লেখার উদ্দেশ্য সেই কারণ খোঁজা নয়। গান্ধী পরিবার যে দীর্ঘদিন আগেই নতুন প্রজন্মের ও নতুন ভাবনায় চালিত ভারতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে একথা সুবিদিত। তাদের মধ্যে কোনো বিনয়,

অনুশোচনা বা ভুল শুধরে নিজেদের সময়োপযোগী করার কোনো তাগিদই ছিল না। পরিবারটি মূলগতভাবে কোনো প্রতিভাকে সম্মান করার কথা ভাবতেও পারে না, কেবল কুক্ষিগত করার ভাবনায় তারা মশগুল। যে কারণে তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সম্ভাব্য তালিকা ভারতীয় তরুণ ভোটদাতাদের কোনো উদ্দীপনা জোগায়নি। যা হবার হয়েছে। এরকম অনেক সময় হয়তো ঘটে নেতৃত্ব দেশবাসীর সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে। কিন্তু একটা প্রাচীন দল তার অস্তিত্ব, পরিচয় একটা পরিবারের তুলনায় তুচ্ছ এ কখনই হতে পারে না। কিন্তু এই দলের ক্ষেত্রে সেটিই সত্যি হয়েছে। পরিবারই দল। দলই পরিবার।

বলতে কোনো দ্বিধা নেই এই মিথ্যে পদত্যাগপত্র দিয়ে এই পরিবার লোক দেখানোর জন্য পদটি ছেড়েছে। ক্ষমতা মোটেই নয়। কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার মতো যোগ্য, প্রতিভাবান, আত্মবিশ্বাসী, স্বনির্ভর কোনো নতুন নেতার সন্ধানে পরিবার আদৌ উৎসুক নয়। এর থেকে বোঝা যায় তারা দলটির সময়োপযোগী উত্তরণ চায় না। তারা এই বিপুল পরাজয়ে কোনো দায়বদ্ধতা অনুভব না করে, শুধু মৌন থেকে বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইছে। কংগ্রেস দলের ওপর এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তো নিশ্চিত পড়ছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো গ্লানিকর প্রভাব পড়ছে আমাদের দেশের এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক ধাঁচার ওপর।

আগেই মূল প্রসঙ্গ তুলেছিলাম যে, কংগ্রেস দল কোমায় চলে গেছে তা একটু অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করলে বোঝায় সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত ঘটেছে। এর পরিণতিতে হাত পা বা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর থেকে ব্যবচ্ছেদ করলেও মস্তিষ্কের কিছুই করার থাকে না। যে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। এর প্রমাণ হচ্ছে কর্ণাটক ও গোয়ার ঘটনা। কংগ্রেসের বিধায়করা ঝাঁকে ঝাঁকে পদত্যাগ, দলত্যাগ করছে। দলের বিপুল শক্তিক্ষয় ঘটছে কিন্তু দলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র অসাড়। সেখানে ক্ষয় বন্ধের কোনো পরিকল্পনাই নেই। আগেই বলেছি দলের সর্বোচ্চ পদের জন্য কেউই আবেদন করবে না। কোনো কানাঘুসো শোনা গেলেও চামচারা পরিবারকে রিপোর্ট করবে। হবু আবেদনকারী পরিবারের রোষে পড়ার ভয়ে গুটিয়ে যাবে। সর্বোচ্চ পদে দক্ষ নিয়ামক না থাকলে কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রণহীন মস্তিষ্কের সুযোগে একটি একটি করে অঙ্গহানি ঘটবে।

দলের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্ববান যে কতিপয় রয়ে গেছেন তার মধ্যে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ একজন তরুণ নতুন কংগ্রেস সভাপতি ঠিক করার কথা বলেছেন। আমি একটি ব্যক্তিগত ইনফরমাল টুইটার পোল করেছিলাম। ৪৩ হাজারের মতো সাড়া দেওয়াদের মধ্যে ৮৬ শতাংশ সচীন পাইলটদের মতো তরুণ কারুর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা বেশি অভিজ্ঞ কিন্তু ক্যারিশমা নেই এমন লোককে চাইছেন না। কিন্তু কাজের কাজ এখনও কিছুই হয়নি। আমি নিশ্চিত, এই অনির্দিষ্টকালের শূন্যতাকে মাথায় রেখে বিজেপি দলের অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থকও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে একটি যথার্থ চলমান শক্তিশালী গণতন্ত্রের পক্ষে শক্তিধর বিরোধী দল থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জকভাবে দেখা যায় কংগ্রেস প্রায়শই বিজেপিকে গণতন্ত্রকে দাবিয়ে রাখার দায়ে অভিযুক্ত করে কিন্তু এ বিষয়ে তাদের যে দায়িত্ব রয়ে গেছে সেকথা তাদের মনে পড়ে না।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। আমাদের দেশ সর্ব বিষয়ে ত্রুটিমুক্ত না হতে পারে কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও প্রবহমান গণতান্ত্রিকতাকেও ভালোবাসি। এই গণতান্ত্রিকতা যখন কোনো একটি পরিবারের এক ধরনের নাটক, কুৎসিত মৌনতা বা বদখেয়ালের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তা আমাদের কষ্ট দেয়। রাজনীতিতে বিরোধী দলের কর্তব্য পালনটা আবশ্যিক। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কোনো প্রতিভাবান মানুষ এসে দায়ভার নিন। অচলাবস্থা কাটান।

শুধুমাত্র একটি পদ থেকে সরে গেলে হবে না কঠোর বাস্তবকে মেনে নিয়ে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিসরই যোগ্যতরকে ছাড়তে হবে। দেশ বড়ো পরিবর্তনের মুখোমুখি। ▮

With Best Compliments

from -

A

Well Wisher

LPL

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ছদ্মবেশী রাজনৈতিক নেতারা সংবিধানের দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিনাশের দিকে নিয়ে চলেছে

ডাঃ আর এন দাস

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর সংবিধান সভায় পাশ করা হয় ভারতীয় সংবিধান যা নাকি বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সংবিধান, এমন কী আমেরিকার সংবিধানের থেকেও বড়ো। এই সংবিধান প্রায় তিন বছরের কিছু কম সময়ে রচনা করা হয়। রামরাজ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে যার প্রথম পাতায় ছিল শ্রীরাম-সীতার ছবিসহ শ্রীরামের অভিষেক পর্ব। সংবিধানের খসড়াটি ৩৮৯ জন সদস্য মিলে ১১ বার সংশোধন করার পর ১৬৫ দিনে সম্পূর্ণ হয়। এতে প্রথমেই লেখা আছে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের কথা। কিন্তু এই কথাগুলি কি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়? আমরা এক হাজার বছর ধরে মধ্য এশিয়া থেকে আসা আরবীয় আক্রমণকারী আর দুশো বছর ধরে পশ্চিমের ইংরেজ শাসনের গোলামি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। ধর্মের ভিত্তিতে জীবন্ত ভারতমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করে, দেশীয় লোভী ও ভ্রষ্টাচারী রাজনেতারা মুসলমান ও ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমে-পূর্বে পাকিস্তান নামক এক ইসলামিক দেশের সৃষ্টি করেছে। এশিয়া মহাদেশে ১৯ শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্য ষড়যন্ত্রের সবথেকে বড়ো শিকার হয়েছে শুধু হিন্দুরাই। ১৫ মিলিয়ন হিন্দু-শিখকে হাজার বছরের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে আজকের খণ্ডিত ভারতে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। দশ লক্ষাধিক নারী-পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, হিন্দুরা আজও সেই সেকুলারিজমের উপর নির্ভর করে বসে আছে, যার কোনো মূল্যই নেই একজন কট্টর কমিউনিস্ট বা কট্টর মুসলমানের কাছে। ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে ইন্দিরা গান্ধী 'সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ও সেকুলার' শব্দগুলি জুড়ে দেন যা কিন্তু ছিল না মূল সংবিধানে। এটা ছিল হিন্দু থেকে ধর্মান্তরণের একটা সহজ আইনি প্রক্রিয়া মাত্র। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে মৎস্যজীবী নিতান্ত গরিব হিন্দুদের কীভাবে খ্রিস্টধর্মে পরিবর্তিত করা যায় তার উদাহরণ দেখা যাবে কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক আর অন্ধ্র প্রদেশের ভোটার লিস্টের পাতায়। ১৯৫১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, দ্বিখণ্ডিত ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩০৬ মিলিয়ন (৮৪.১,%), আর পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও কিন্তু ভারতে থেকে গেল ৩৪ মিলিয়ন (৯.৮%) মুসলমান। স্বাধীনতা পরবর্তী ৭০ সালে কংগ্রেস সরকারের কল্যাণে ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে তাদের সংখ্যা নাকি ১৭২ মিলিয়নে পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যানে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই বন্যার স্রোতের মতো আসা রোহিঙ্গা বা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি, আফগানি আর পাকিস্তানি মুসলমানদের ধরা হয়নি। হিন্দু-শিখের সংখ্যা তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে যেটাকে সুনিপুণভাবে লুকানো হয়েছে ২০১১ সালের লোকগণনায়। কারণ, এক বিশেষ সম্প্রদায়ের তুষ্টিকরণ এবং ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্স এবং যার হোতা ২১টি বিরোধী পার্টি। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো কংগ্রেস। আর কংগ্রেস ভেঙে পশ্চিমববঙ্গে তৈরি হওয়া তৃণমূল কংগ্রেস আর মুসলিমদের সর্বকালের সর্বঋতুর সঙ্গী মার্ক্সবাদী আর মাওবাদীরা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্তরের দশকে কানু সান্যাল, চারু মজুমদার ও আজিজুল হকদের নেতৃত্বে নকশালিদের তাণ্ডব জনগণের দৃষ্টিকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের করে রেখেছিল বিভ্রান্ত। আর ঠিক সেই সময়েই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের চলছিল তুমুল লড়াই। সীমান্তে সৈন্যরা প্রাণ দিচ্ছে আর দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল সেইসব হিন্দুনামধারী মুসলমান ও খ্রিস্টান মিশনারিদের দলদাস রাজনেতাদের তৈরি নকশালবাদ। আসলে এরা মুসলমানদেরই ছদ্মবেশী সৈন্য এবং এক গেরিলা যুদ্ধের কৌশল মাত্র। কাশ্মীরের পাথরবাজ আর সন্ত্রাসবাদীদের এরাই বলে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা। রোহিঙ্গাদের জন্য ঘড়া ঘড়া অশ্রুবর্ষণ করে কিন্তু পাকিস্তান, বাংলাদেশ অথবা কেরল বা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের নিপীড়নে এরাই হয়ে যান মৌনীবাবা। দিল্লির দুর্গা মন্দিরের উপর আক্রমণ, ধ্রুব ত্যাগী ও ডাঃ নারাঙের মৃত্যু বা কলকাতার হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর আক্রমণে শুনেছেন কোনো 'মোমবাতি মিছিলে'র কথা? নামে ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ভোটের জন্য সব সরকারই, রাজ্যে কিম্বা কেন্দ্রে মুসলমানদের জন্য 'সংখ্যালঘু সেল' আর হিন্দুর ট্যাক্সের টাকা থেকে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের নানারকম সুযোগসুবিধা এবং অনুদান দেওয়া হচ্ছে। 'ওয়াকফ বোড' আর 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের' কাছে আছে হিন্দুনিধনের চাবিকাঠিটি। প্রতিটি মুসলমানই জানে হিন্দু

তাদের শত্রু বা কাফের। আর তার পরিণামও কী হবে তাও লেখা আছে তাদের ধর্মগ্রন্থে। ভারতে মিশনারিদের কাছে যে পরিমাণ ভূ মিসম্পদ আছে, তা কোনো হিন্দু প্রতিষ্ঠানের কাছেও নেই। হিন্দু মন্দিরের প্রণামীর টাকায় দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিশালাকায় চার্চ ও মসজিদ তৈরি হয়। হিন্দুমন্দিরগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় অকালেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জানেন কি, ২০১৯ সালের ভারতের সংসদে ২৭ জন কট্টর হিন্দুবিরোধী মুসলমান সাংসদ এসেছেন? জানেন কি, ভারতের উত্তরপূর্বখণ্ডে আটটি রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, কিন্তু তারা কোনোরকম বিশেষ সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত কেন? জানেন তো জম্মু ও লাদাখ অঞ্চল জনসংখ্যা বা আয়তনে কাশ্মীরভ্যালির থেকেও বৃহৎ কিন্তু গত ৭০ বছর ধরে কাশ্মীরের মুসলমান শাসকরা জোর করে অন্য দুটি অঞ্চলকে পদদলিত করে রেখেছিল এবং ১৯৯০ সালে সমস্ত হিন্দুকে কাশ্মীর থেকে একরাত্রে একবস্ত্রে বিতাড়িত করা হয়েছে।

ষাটের দশকে চীন (১৯৬২) আর পাকিস্তানের (১৯৬৫) সঙ্গে যখন ভারতীয় সেনারা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বীরগতি প্রাপ্ত হচ্ছিল, সেসময় ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে শত্রুপক্ষের দালাল সিপিআই, এসইউসি এবং সিপিএমের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশ্যে ন্যক্কারজনকভাবে সমর্থন করেছিল শত্রুপক্ষকে। মনে আছে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কেরালায় মালাবার উপত্যকায় মোপলা মুসলমানের দ্বারা পাঁচহাজার হিন্দুহত্যাকে কীভাবে মার্ক্সবাদীরা শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস বলে আসল সত্যকে বিকৃত করে গোয়েবলীয় প্রথায় প্রচারপ্রসার করেছিল? এবারে রাহুল গান্ধীর কেরালার 'ওয়াইনাড' থেকে লোকসভা নির্বাচনে জেতার রহস্যটা কী বলে দিতে হবে কি? আজ থেকে একশো বছর আগে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (মুন্সীরাম ভিজ) কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘরবাপসি বা শুদ্ধিকরণ শুরু করা'। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যখন ১৬৭৪ সালে পুণা জয় করে ফিরছিলেন, রাস্তার দুপাশে দাঁড়ান ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আবার তাদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। বিজেপির সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম্ স্বামীর কথায়, 'ভারতীয় উপমহাদেশে যত মুসলমান আছে তাদের সবার পূর্বপুরুষই হিন্দু ছিলেন'। আজকের কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লা ও বিজেপিনেতা এমজে আকবরও স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও হিন্দু ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালেই বুঝেছিলেন, হিন্দুর বিনাশ রোধ করতে হলে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের হিন্দু মহাসভার সৃষ্টিও ঠিক এই কারণেই হয়েছিল। অপরিহার্য কারণেই আজ বিভিন্ন সংস্থার 'ঘরবাপসি' বা পুনরায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু এর আবশ্যকতার কথা আমাদের পথের দিশারি পূর্বপুরুষরা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

১৯১২ সালে কলকাতার আর্য সভা মন্দিরে শ্রদ্ধানন্দজীর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগের বাঙ্গালি কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনিও শুদ্ধিকরণ পদ্ধতিকে দ্বিধাহীন ভাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'বহুবছর ধরে রাশিবিজ্ঞান অনুশীলন করে তাঁর মনে হয়েছে মাত্র ৪২০ বছরের মধ্যেই সনাতন হিন্দুধর্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হবে যদি না জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে এর প্রতিকার করা যায়। তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার তৈরি ১৯১১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান, যে মাত্র ৩০ বছরে হিন্দুর জনসংখ্যা ৭৪% থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৯% হয়েছে (ইণ্ডিয়ান সেনসাস গেজেট ঃ ভল্যুম ১; পৃষ্ঠা ১২২)। অর্থাৎ ৫% হ্রাস পেয়েছে। আর এভাবে যদি একতরফা হিন্দুর অবাধ ধর্মান্তকরণ চলতে থাকে এবং ১ প্রজন্মকে যদি ৩০ বছর ধরা যায়, তাহলে মাত্র ১৪ প্রজন্মেই (৩০ গুণিতক ১৪ = ৪২০) সনাতন হিন্দুর দেশ ভারতভূমি থেকে হিন্দু নামটি মুছে যাবে। সেই সময় কর্নেল মুখার্জি একক প্রচেষ্টায়, ১৯০১ সালের জনগণনার সঙ্গে ১৯১১ সালের তুলনা করে, একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন যার নাম 'হিন্দুস, এ ডাইং রেস'। পুস্তিকাটির প্রকাশনের পর সারা ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অনেকেই মেনে নিতে পারেননি এমনকী ঋষিঅরবিন্দ পর্যন্ত এর সঙ্গে একমত হতে পারেননি, (দ্রঃ কর্মযোগীন; ৬ই নভেম্বর, ১৯০৯)। যাইহোক প্রখর বাস্তববাদী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯২৩ সালে আগ্রার কাছে লক্ষাধিক 'মালকানি' মুসলমানকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন যাদের পূর্বপুরুষরা রাজপুত ছিলেন। অবশ্য তার জন্য তাঁকে প্রাণও আহুতি দিতে হয়েছিল ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৬ সালে আব্দুল রশিদ নামের এক ধর্মান্ধের গুলিতে দিল্লির জামা মসজিদের চত্বরে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে 'শ্রদ্ধানন্দ পার্ক' স্থাপিত হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে, সূর্যসেন স্ট্রিট ও বৈঠকখানা রোডের সংযোগস্থলে।

যাইহোক, সেই জটিল প্রশ্নটা, যেটা নিয়ে ভারতের তথাকথিত সমাজবাদী, সেকুলারপন্থী এবং মার্ক্স ও মাওবাদী নেতাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিরন্তর মতান্তর চলছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ইসলামিক দেশ হতে বাধা নেই কিন্তু ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলা যাবে না। সমস্ত হিন্দুদের জন্য, ২০০৬ সাল পর্যন্ত নেপালই একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র ছিল কিন্তু হিন্দুনামাধারী লোভী ও ভ্রষ্টাচারী নেতারা (নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র করে ধর্মনিরপেক্ষতার তকমা দিয়ে অবাধে হিন্দুর ধর্মান্তরণ করে দেশটাকে ইসলামিক ও খ্রিস্টান দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এর প্রতিকার কল্পে ভারতের সংবিধানের আমূল সংশোধন অত্যন্ত জরুরি, কারণ ইতিহাস বিকৃতকারী হিন্দুনামধারী ইসলামের একনিষ্ঠ পূজারি মমতা-মায়া-মুলায়মের মতো ছদ্মবেশী রাজনৈতিক নেতারা সনাতন হিন্দুর দেশ থেকে অচিরেই হাজার হাজার বছরের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ■

মব লিনচিং সরকারকে বদনাম করার এক অপচেষ্টা

রঞ্জন কুমার দে

কিছুদিন আগে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট সতীশ আচার্যের একটি কার্টুন সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব চর্চা হয়েছিল। কার্টুনটি ছিল ভক্তদের উদ্দেশে ভগবান রামের অনুরোধ— 'Not in my Name'। এই কার্টুনে স্পষ্ট চিত্রিত আছে একদল উন্মুক্ত ভিড় গাছে বেঁধে অসহায় এক ব্যক্তিকে খুব মারধর করছে। মারতে মারতে ওই ব্যক্তিকে 'জয় শ্রীরাম' বলার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। পাশেই কাঁধে তির-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাম। তিনি সেই উন্মুক্ত জনতাকে হাত জোড় করে কাতর অনুরোধ করছেন 'দয়া করে আমার নামে নয়।' কার্টুনটি আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া সম্প্রতি কয়েকটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ঘটনার ছবি চিত্রায়িত করেছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের কিছু দুষ্কৃতী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিকে পুঁজি করে ভগবান রামের নামকে কুলষিত করছে। রাম তো স্বয়ং ন্যায় ও দয়াশীলতার প্রতীক। আর রামরাজ্য হচ্ছে শৌর্য, সমৃদ্ধি এবং আদর্শের দ্যোতক। যদিও ১৯৯২ সালে রাম মন্দিরের দাবিতে রামভক্তরা পুরো দেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে ধার্মিক হিন্দুদের মধ্যে 'রাম রাম', 'জয় সিয়া রাম', এবং 'জয় শ্রীরাম কি' বলে সংবর্ধনা জানানোর রেওয়াজ অনেক পুরোনো। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে কোনো প্রকার হিংসা বা ভীতির সামান্য শ্লেষ থাকতে পারে না। কোনো ধর্মগ্রন্থে কিংবা ধর্মীয় নেতার সুরেও থাকা উচিত নয়। এখন ধর্মের চেয়ে রাজনীতিতে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান উচ্চারিত হওয়ায় একদল মানুষ রামের নামে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পথ বেছে নিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। মমতা ব্যানার্জি যখন সংখ্যালঘু তোষণে বেপরোয়া তখন বিজেপি রামনামে পশ্চিমবঙ্গের গদি দখল প্রায় স্থির করে নিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এতই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে যে বিজেপির রাম নবমীর পাল্টায় তারাও রামনবমী উদ্‌যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বিপত্তি ঘটল যখন মমতার উদ্দেশে জয় শ্রীরামের জয়ধ্বনি ছুঁড়ে দেওয়া হলো। মমতা পারতেন নিজেকে স্থির রেখে জয় শ্রীরামের ধ্বনিতে শামিল হতে। তা না করে তিনি 'জয় শ্রীরাম' শুনেই গ্রামের পাগলি বুড়ির মতো খেপে যাচ্ছেন। তাঁর এই অপরিপক্কতার ফল ২০১৯-এর লোকসভায় অবশ্যই পেয়েছেন। কোনো ধ্বনি খুব স্পর্শকাতর হয় যখন সেটা জোর করে কাউকে মানানো হয় বা যারা বিশ্বাস রাখে তাদের ধমক দেওয়ায়। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মব লিনচিংয়ের ঘটনা ঘটেই চলছে। ২০১৯-এর মে মাসে হরিয়ানার জামে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে আসার সময় এক মুসলমানকে পিটিয়ে জবরদস্তি জয় শ্রীরাম বলানোর অভিযোগ আসে। ২৮ মে ২০১৯-এ মথুরায় এক রাশিয়ান ঈশ্বরভক্তকে দু'বার 'রাম রাম' বলার চাপে গলায় ছুরি গেঁথে দেওয়া হয়। কলকাতার পার্ক সার্কাসে 'জয় শ্রীরাম' না বলায় মোহাম্মদ শাহরুখ নামের এক ব্যক্তিকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। উত্তরপ্রদেশে কয়েকজন বাইক আরোহী তাজ নামের এক ব্যক্তির মাথার টুপি খুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঝাড়খণ্ডের জামতারা এলাকায় লুঙ্গি পরিহিত এক ফল বিক্রেতাকে বলপূর্বক 'জয় শ্রীরাম' বলতে বললে উনি রামায়ণ পাঠ শুরু করে দেন, আসলে উনি হিন্দু ছিলেন যেটা তার পোশাকে দুষ্কৃতীরা সঠিক অনুমান করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ায় 'জয় শ্রীরাম' না বলায় ১১ বছরের এক মাদ্রাসা ছাত্রকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ওড়িশার বছর চব্বিশের এক যুবককে মব লিনচিঙের ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়। ২২ জুন ২০১৯ তরবেজ আনসারিকে বাইক চুরির অভিযোগে একটি ভিড় টানা কয়েকঘণ্টা মারধর করে এবং পুলিশি হেফাজতে তরবেজ আনসারির মৃত্যু ঘটে। আসলে এগুলি সবই চক্রান্ত। উদ্দেশ্যে হলো মোদী সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা।



ঝাড়খণ্ডের গণপিটুনির ঘটনা রাষ্ট্র সঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদে আলোচনা হয়। কিন্তু ভারতে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু এবং তাদের উপসনাস্থলে হামলার ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষতার ভারী পাথরে চাপা পড়ে যায়। ...নির্দিষ্ট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশকে কিছুদিন পরপর অস্থির করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে।

মব লিনচিঙের এই ঘটনায় দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। অল ইন্ডিয়া জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ্ বিশেষ চিন্তা প্রকট করতে গিয়ে মব লিনচিঙ আটকাতে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে সরকারকে আহ্বান জানান। হায়দরাবাদের সাংসদ তথা AIMIM প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি বিজেপি-আরএসএসকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন 'পিঠিয়ে হত্যা করা পিএম মোদীর সংস্কার। মব লিনচিংয়ের জন্য

ভারতের ইতিহাস মোদীজীকে স্মরণ রাখবে।" কোনো প্রমাণ, তথ্য ছাড়া দেশের এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর জন্য ওয়েসি অ্যান্ড গ্যাং বিজেপি-আর এস এসকে দায়ী করছে, অথচ এরাই দেশের জঙ্গি আক্রমণ ও ধর্ষণকাণ্ডে সাফাই দেন অপরাধীর কোনো জাত ধর্ম থাকতে পারে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তান, বাংলাদেশ সরকারের মতো বোবা কিংবা অন্ধ নন। উনি মহান সংসদে দাঁড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের মব লিনচিঙের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আদেশ দিয়েছেন। এর আগেও ভুয়ো গো-রক্ষকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে আইন হাতে তুলে না নিতে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মোদীজী ২০১৯-এর বিশাল জয়ের পরে প্রথম ভাষণে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস' ধ্বনি দেশের সকল ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর সমানাধিকারের আওয়াজ তুলেছেন। মোদী সরকারের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক স্কুলছুট সংখ্যালঘু ছাত্রীদের দেশের মুখ্যধারার শিক্ষায় উদ্যোগী করতে মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাদ্রাসায় হিন্দি, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোদী সরকারের 3E পলিসি অর্থাৎ Education, Employment, Empowerment-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক, প্রফেশনাল এবং টেকনিক্যাল কোর্সের সহায়তায় ৫ কোটি সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে, তার ৫০ শতাংশ ছাত্রী হবে। এই বৃত্তিতে আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রীদের জন্য ১০ লাখেরও অধিক 'বেগম হজরত মহল বালিকা ছাত্রী বৃত্তি' যুক্ত আছে। সংখ্যালঘু মন্ত্রক 'পড়ো এবং বাড়ো' জাগরতা অভিযান দেশের প্রথম ৬০ ধর্মীয় সংখ্যালঘু এলাকা থেকে শুভারম্ভ হবে। এ ছাড়াও কেন্দ্র এই সরকার তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্তে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া অল্পসংখ্যক তথা মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পারসি যুবাদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফ্রি কোচিং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোদী সরকারের ধর্মীয় অল্প সংখ্যকদের প্রতি এরূপ সিদ্ধান্ত সবকা সাথ বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাসের প্রতিফলন।

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি কাউকে দিয়ে জবরদস্তি বলানো নিশ্চিত অপরাধ, তেমনি কাউকে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে বাধাদান করাটাও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫-এর 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার' খর্বের আওতায় পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের বাখারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে কয়েকজন পড়ুয়া জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায় বহিরাগত কিছু যুবক বিদ্যালয়ে ঢুকে বেধড়ক মারধর করে। ঠিক তেমনি হাওড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ে প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্র আরিয়ান সিংহ জয় শ্রীরাম বলায় ওই স্কুলের শিক্ষকের হাতে নিগৃহ হয়। নবদ্বীপে শঙ্কর দেবনাথ নামে বছর একত্রিশের যুবককে 'জয় শ্রীরাম' এবং 'নরেন্দ্র মোদী' জিন্দাবাদ স্লোগান তৃণমূল গুন্ডারা সেই বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনাগুলো দেশের মিডিয়া হাউস এবং বুদ্ধিজীবীদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বা মব লিনচিংয়ের সংজ্ঞায় আসবে কিনা জানা নেই! দেশের একটি বিশেষ মহল মিথ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার জিগির তুলে আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে চায়। উদারণস্বরূপ উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে এক মাদ্রাসা ছাত্রকে মারধর করে 'জয় শ্রীরাম' বলানোর অভিযোগ আসে। কিন্তু প্রদেশের এডিজি তদন্ত করে জানতে পারেন ঘটনাটি খেলার ময়দানে বাচ্চাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা নিয়ে সামান্য ঝগড়াকে অহেতুক সাম্প্রদায়িকতার রং ঢালার চেষ্টা করা হয়।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে আসগর আলিকে কান ধরিয়ে জবরদস্তি 'জয় শ্রীরাম' বলিয়ে উঠবস করানো হচ্ছে। পরে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে তৃণমূল আশ্রিত আফসি মিঞা বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য নিজে ঘটনাটি ঘটায়। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে এক অটোচালককে মধ্যে রাতে কিছু দুষ্কৃতী 'জয় শ্রীরাম' বলানোর জন্য মারধর করার অভিযোগ আসে। তদন্তে শহরের এসপি রবীনা ত্যাগী জানান, সেটি মদের টেবিলে বন্ধুদের মধ্য ঝগড়া এবং মারধরের ঘটনা, কোনো সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা নয়। তাই এটা স্পষ্ট যে এরকম অনেক মিথ্যে সাজানো ঘটনায় শ্রীরামের নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে। কয়েকবছর আগে এরকম জুবায়ের নামক এক যুবককে সাম্প্রদায়িক হিংসায় ট্রেন থেকে ফেলে মারার গুজব উঠেছিলো, পরে তদন্তে প্রমাণ হয় ঘটনাটি ছিল নিছক ট্রেনের আসন নিয়ে ঝগড়া।

এরকম ভুয়ো ও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় স্বতন্ত্রতা রিপোর্ট ২০১৮-তে ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের হামলার অভিযোগ আনে। ঝাড়খণ্ডের গণপিটুনির ঘটনা রাষ্ট্র সঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদে আলোচনা হয়। কিন্তু ভারতে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু এবং তাদের উপসনাস্থলে হামলার ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষতার ভারী পাথরে চাপা পড়ে যায়। রাজস্থানে এক দলিত যুবক মুসলমান মেয়েকে ভালোবাসায় মব লিনচিংয়ের শিকার হয়ে মৃত্যু ঘটে। বিহারে ভগবানপুরের কাউন্সিলর মহম্মদ খুরশিদ তার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে এক হিন্দু মা-মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং মাথার চুল কেটে দেয়। সিউড়ির বারুইপুর গ্রামে মাহফিজুর, খায়রুল, বাবু শেখরা হিন্দুদের মেরে গ্রামছাড়ার ফরমান দিয়েছে। রাজধানী দিল্লির ১০০ বছরের দুর্গামন্দির মুসলমান গুন্ডারা গুড়িয়ে দিয়েছে, এরকম হাজারো ঘটনা কয়েক পৃষ্ঠায় লিখে শেষ করার মতো নয়। কিন্তু হায়, নির্দিষ্ট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশকে কিছুদিন পরপর অস্থির করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ৭ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মব লিনচিংয়ের ঘটনায় ভারতে মোট ১৪১ জনের প্রাণহানি ঘটে, যেখানে ৭০ জন মুসলমান এবং ৭১ জন হিন্দু। এটা অত্যন্ত সুখকর খবর যে মব লিনচিংয়ের ঘটনা আটকাতে উত্তরপ্রদেশ সরকার দোষীদের জন্য আজীবন কারাবাসের আইনপ্রণয়ন করতে চলেছে। ■

চিকিৎসকদের ওপর হামলা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয়

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা হলো চিকিৎসকদের ধর্মঘট যা কিনা কলকাতার নীলরতন সরকার হসপিটাল থেকে আরম্ভ হয়ে সর্বভারতীয় রূপ নেয়। সমগ্র ভারতে যেভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এ আই আই এম এস-এর চিকিৎসকরা মাথায় হেলমেট পরে রুগি দেখা শুরু করলেন কলকাতার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়।

হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর হামলার ঘটনা নতুন নয়, রোগীর মৃত্যুর পর চিকিৎসকদের আক্রমণ করা হয়েছে, হাসপাতালে ভাঙচুর হয়েছে, অশান্তি হয়েছে অনেকবার। কিন্তু এবার ট্রাকবোঝাই হয়ে ২০০ জন জেহাদি দুষ্কৃতী যেভাবে হঠাৎ হাসপাতালে চড়াও হয় ও তাণ্ডব শুরু করে, তা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। পরিবহ মুখোপাধ্যায় নামে এক জুনিয়র ডাক্তারের মাথায় এমন ভাবে আঘাত করা হয় যে সে কোমায় চলে যায়। এর পরেই চিকিৎসকরা কর্মবিরতি শুরু করেন। এনআরএস হাসপাতাল থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও আন্দোলনে যোগ দেন। জুনিয়র চিকিৎসকরাও প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁরা গণ-ইস্তফা দেন। খুব অল্পের মধ্যেই এই আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলনের চেহারা নেয়। সাধারণ মানুষের হয়রানি হয়, তবে হাসপাতালগুলিতে জরুরি বিভাগ খোলা রাখা হয়েছিল। বহু চিকিৎসককে হাসপাতালের বাইরে রোগী দেখতে দেখা যায়।



যেহেতু এবার ট্রাকবোঝাই সমাজবিরোধীরা এসে তাণ্ডব চালায় এবং পুলিশকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি, পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, একজন জুনিয়র চিকিৎসকের প্রাণ সংশয় হয়। সে কারণেই এবার পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসকরা ভগবান নন, তাঁদের উপর হামলা করা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য কাজ নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যদি চাইতেন, খুব তাড়াতাড়িই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু ইগো- সর্বস্ব মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকারী চিকিৎসকদেরই নানা ধরনের ধমকানি দিলেন আন্দোলন বন্ধ করার জন্য। কিন্তু গোড়ায় গলদ থেকে গেল। কথা হচ্ছে রোগীর পরিবারের লোকজন কি করে জানলেন যে ভুল চিকিৎসার জন্য একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষের জীবনহানি হলো? তারা কি নিজেরা চিকিৎসক? অথবা কোনও প্রকার ইনভেস্টিগেশনের পরে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে?

বেশ কিছুদিন পরে মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়র ডাক্তারদের নবান্নে ডেকে দেখা করলেন, তাদের বক্তব্য শুনলেন। সব টিভি চ্যানেলকে ঢুকতে দিলেন না। তাঁর পছন্দের দুটি মাত্র চ্যানেলকে অনুমতি দিলেন লাইফ কভারেজের জন্য।

শেষ পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের লক্ষ্মীছেলে বলে অভিহিত করে মাথায় হাত বুলিয়ে ছিলেন। ধর্মঘট স্থগিত হলো।

ট্রাক বোঝাই হয়ে যে সমাজবিরোধীরা এসে তাণ্ডব চালিয়েছিল, জুনিয়র ডাক্তাররা তাদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছিলেন কিনা, জানা যায়নি। যারা একজন ডাক্তারকে মারাত্মক আঘাত করে কোমায় পাঠিয়ে দিল, তাদের শাস্তির দাবি করেছিলেন কি তাঁরা? মিডিয়া মারফত জানা গেল না ওইদিন যারা গুন্ডামি করে চলে গেল বিনা বাধায়, তাদের কী শাস্তি হলো, তাদের প্রতি কোনও অ্যাকশন সরকারের তরফে নেওয়া হলো কিনা। ডাক্তাররাই গুন্ডাদের শাস্তির দাবি করেছিলেন কিনা, তাও জানা গেল না।

এ ব্যাপারে যদি ডাক্তাররা, মিডিয়া, সাধারণ মানুষ চুপ থাকে, তাহলে ওই সমাজ-বিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে এবং ওই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো আটকানো যাবে না। আমজনতার হাতে ক্ষমতা নেই, কিন্তু ডাক্তাররা এই দাবিটা মুখ্যমন্ত্রীরর কাছে তুললেন না কেন? মিডিয়া এই বিষয়টা নিয়ে সোচ্চার হলো না কেন?

ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলগুলি পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলা অন্যায় অবিচারগুলি সদাসর্বদাই তুলে ধরে, সমালোচনা করে, যেটা আমরা বাংলা টিভি চ্যানেলগুলিতে পাই না, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। কিন্তু এই ব্যাপারে ন্যাশনাল চ্যানেলগুলিরও কোনও উচ্চবাচ্য দেখা গেল না। জানি না ওই দুষ্কৃতীদের কোনও শাস্তি আদৌ হবে কিনা, না হলে তা হবে আমাদের জন্য অতিশয় দুর্ভাগ্যজনক। ■



নুসরতের বিরুদ্ধে ইমামি ফতোয়া

ধীরেন দেবনাথ

বসিরহাটের নবনির্বাচিত সাংসদ নুসরত জাহান সম্প্রতি বস্ত্র ব্যবসায়ী ও কলকাতার বাসিন্দা নিখিল জৈনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানটি হয়েছে অবশ্য বিদেশে। দেশে ফিরে তিনি সংসদে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেন। আর সেই শপথানুষ্ঠানে তিনি ছিলেন নববধূর বেশে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, হাতে পলা-শাঁখা এবং গলায় মঙ্গলসূত্র পরিহিতা এক হিন্দু বাঙ্গালি বধূ। শপথ গ্রহণ শেষে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করেন। আর এই বেশ ও উচ্চারণ তাঁর কাল হয়।

উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দের দার-উল-উলুমের ইমাম মুফতি আজাদ ওয়াসিম নুসরতের ওই আচার-আচরণকে ভালো চোখে নেননি। তিনি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ফতোয়া জারি করেন। তাঁর বক্তব্য, নুসরত মুসলমান, সিঁদুর পরার অধিকার নেই। আসলে মুসলমান নুসরতকে হিন্দু বধূবেশে চাক্ষুষ করে ইমাম সাহেব তাঁর মেজাজ হারান এবং তাঁর ক্রোধ ওঠে চরমে। অবশ্য বিদ্বেষমূলক ফতোয়া জারিতে দেওবন্দের যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। ইতিপূর্বেও এখান থেকে বহু সাম্প্রদায়িক ফতোয়া জারি হয়েছে। সেসব নিয়েও সারা দেশে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। নুসরতকে নিয়েও ওই ইমাম বা মুফতির সাম্প্রদায়িক মন্তব্য বা ফতোয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় উঠেছে।

ভারত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সংবিধানের দৃষ্টিতে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, আচার, মত, পথ, পোশাক, উপাসনা অঞ্চল ভেদে সব মানুষ এক। ভারতীয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পালনের দায়দায়িত্ব যেন একমাত্র হিন্দুদের। আর মুসলমানদের একটা বড়ো অংশের সেই দায় নেই। তারা মন-মানসিকতায় শরিয়তপন্থী। ইসলামিক ভাবধারা চালিত ও তাড়িত। প্রায় ছয় দশকের কংগ্রেস সহ সেকুলারবাদী শাসকরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে করে গেছে শুধু নির্ভেজাল মুসলমান তোষণ। আর হিন্দুদের ভাবাবেগকে দুর্বল করে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করেছে। যার বিষময় ফল তাই আজও ফলছে। বাক্‌স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তারা যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছে। আসলে তারা থাকেন ভারতে কিন্তু মনে-প্রাণে জেহাদি-পাকিস্তানি। ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে জেহাদি মুসলমান যুবকরা হিন্দু নারীদের লাভ জেহাদের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করে শয্যাসঙ্গিনী করেছে। কই, তা নিয়ে তো কোনো ইমাম-উলেমা বা মুফতি-মৌলানা মুখ খোলেন না। কেন? না, ওটা যে ইসলামের রীতি-নীতি ও অনুশাসনের অঙ্গ। অবশ্য নুসরতের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারির ক্ষেত্রে ইমাম মুফতি ওয়াসিম একাই নন, আছেন আরও বহু ইমাম। এঁরা ধর্ম গুরু, না সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শুরু? শোনা যাচ্ছে, এই ফতোয়া জারির পিছনে রয়েছে আরও কিছু গোঁড়া ইসলামপন্থীর উস্কানি। নুসরতও এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন। তবে মুখ রক্ষার জন্য।

অতঃপর ওইসব ফতোয়াবাজ ধর্মগুরু ও তাঁদের সাকরেদদের কাছে প্রশ্ন, চীনে তো প্রশাসন মুসলমানদের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে। মুসলমান নাম বদলে চীনা নাম রাখতে হবে বলে নির্দেশ জারি করেছে। প্রকাশ্য স্থানে নামাজ পড়া ও মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাজার হাজার মসজিদ ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। খাদ্যাখাদ্য পরিবর্তনে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকী, ইসলামিক ধর্মীয় গুরু ও উগ্রবাদীদের সংশোধনাগারে ঢুকিয়ে মগজধোলাই করাও হচ্ছে। আর এসব ঘটনার কথা বা খবর নিশ্চয়ই মোল্লা-মৌলবিদের অজানা নয়। তাহলে এ ব্যাপারে তাঁরা কেন মুখে কুলুপ এঁটে আছেন? চীন মহাশক্তিধর দেশ বলে? পাকিস্তানের বন্ধু বলে? আর 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' বেচারি নুসরত?

ইতিপূর্বে মন্দিরে পুজো দেওয়ার অপরাধে নুসরতকে ভোট না দেওয়ার ফতোয়া জারি করেছিলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের একশ্রেণীর হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান ও ইসলামি ধর্মগুরু। কিন্তু অবস্থা বেগতিক বুঝে শাসকদলের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁদের বুঝিয়েছিলেন এই বলে যে, নুসরতকে ভোট না দিলে বিজেপি সুবিধা পেয়ে যাবে। তাই ধর্মগুরু বা ফতোয়াপন্থীদের অন্য ধর্মকে মর্যাদা দিতে শিখতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে কথায় কথায় আর ফতোয়া জারি করাবেন না, 'ইসলাম বিপন্ন' বলে ধুয়ো তুলবেন না। আজ বিশ্বজুড়ে যে ইসলামি সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত ও নরহত্যার জেহাদ চলছে, তার জন্য বহুলাংশে মৌলবীরা দায়ী। 'কাফের' (বিধর্মী) নয়, মানুষকে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব ভাবুন। 'জেহাদ' নয়, অমানবতা তথা পাশবিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হোন। আর মধ্যযুগীয় কুপ্রথা 'ফতোয়া'কে বিদায় জানিয়ে আহ্বান করুন ভ্রাতৃত্ব, মমত্ব ও ভালোবাসাকে। সবাইকে দেখুন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে। ধর্ম হচ্ছে সেটাই।

নতুন ভারতে বন্দে মাতরমের নবরূপ ‘জয় শ্রীরাম’

রাজ্য রাজনীতি

সাধন কুমার পাল

শব্দ ব্রহ্ম। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে বন্দে মাতরম্ ছিল মৃত্যুঞ্জয়ী শব্দ। দেশমাতৃকার পুজোর মন্ত্র। বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করে বিপ্লবীরা অনায়াসে ফাঁসির মঞ্চে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেন, সাধারণ মানুষের রক্তে খেলে যেতো বিদ্যুৎ। ভীরু কাপুরুষও উঠে দাড়িয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়তেন, মায়েরা অক্লেশে নিজের শরীরের গহনা খুলে তুলে দিতেন বিপ্লবীদের হাতে, নিজের স্বামী-পুত্রকেও সমর্পণ করতেন ভারতমাতার চরণে। বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ মাত্রই শৃঙ্খলমুক্ত ভারতমাতার ছবি ভেসে উঠতো ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায়। শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে বন্দে মাতরম্ই ছিল দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর জপের মন্ত্র, গানের কলি, বিপদের ইষ্টনাম, স্বদেশমন্ত্রের ধ্বনি।

কিন্তু এই বন্দে মাতরম্ শুনলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কানে যেন গরম সিসা প্রবেশ করতো। এক অজানা আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতা, গ্রাস করতো সাম্রাজ্যবাদীদের। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের এক ভয়ংকর দৃশ্য। কিছু কট্টরপন্থী মুসলমান যাদের কাছে আগে নিজের মুসলমান সত্তা তারপর দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি, তাদের কাছে বন্দে মাতরম্ পৌত্তলিকতার নামান্তর। অতএব ইসলাম বিরোধী। বন্দে মাতরমের বজ্রনির্ঘোষ পরম পরাক্রমশালী ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করলেও ওই কট্টরপন্থী ইসলামিক গোষ্ঠী কিন্তু ভারতেই রয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতে এই কট্টরপন্থীদের তোষণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বন্দে মাতরম্কে নবলব্ধ স্বাধীনতায় কাজে লাগিয়ে নতুন ভারত গড়ে তোলার মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ না করে একটি সাধারণ স্লোগানে পর্যবসিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার প্রায় সাতদশক পরে ১৯১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠনের পর প্রথমবার ‘নতুন ভারত’ গড়ার ভাবনাকে একটি বড় রাজনৈতিক সঙ্কল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই নতুন ভারত গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আরও বেশি আসনে জয়ী হয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপি সরকার। পারিবারিক শাসন মুক্ত, জাতপাত ইস্যুমুক্ত ভারতীয় রাজনীতির গুণাত্মক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিদেশেও ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনির জোশ দেখে মনে হয় এ যেন সেই বন্দে মাতরম্ ধ্বনি নতুন সুরে, নতুন ভাবনায়, নবকলেবরে অবির্ভূত হয়েছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে যেন নতুন ভারত গঠনের প্রেরণার উৎসস্থলগুলি পুনরায় জেগে উঠছে। অপর দিকে ভারত-বিরোধী অপশক্তি ও তার দোসররা এই ধ্বনি শুনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, অস্থির হয়ে উঠছে। ফলে পরাধীন ভারতের মতো যেন এক সম্মুখ সমরের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

জয় শ্রীরাম ধ্বনির উৎপত্তি কখন কোথায় হয়েছে এটা বলা সম্ভব না হলেও রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময় সুনামির ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল এই ধ্বনি। বন্দে মাতরমের মতো জয় শ্রীরামও যে মৃত্যুঞ্জয়ী ধ্বনি তা ১৯৯০ সালে প্রমাণ হয়ে গেছে। ওই বছর ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে করসেবা হওয়ার কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে ২১ অক্টোবর থেকে অযোধ্যায় করসেবকরা জমায়েত হতে শুরু করে। করসেবা রুখে দেওয়ার জন্য সেদিন অযোধ্যায় নজিরবিহীন ভাবে ২৮০০ সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদব ঘোষণা করেছিলেন যে ‘অযোধ্যায় একটি পাখিও প্রবেশ করতে পারবে না।’ কিন্তু এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে ৩০ অক্টোবর জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে রামভক্তরা অযোধ্যায় প্রবেশ করেছিল। কলকাতার কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয় সেদিন বিতর্কিত ধাঁচার উপরে গেরুয়া পতাকাও তুলে ধরেছিলেন। মুলায়ম সিংহের নির্দেশে সেদিন রামভক্তদের ওপর সরাসরি গুলি চালিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। দেখতে



দেখতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে উজ্জীবিত রামভক্তদের শব। সরযূর তীরে পদপিষ্ঠ হলেন অনেক রামভক্ত। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ৭২ ঘণ্টা পর ২ নভেম্বর আবার গুলি চলল রামভক্তদের উপর। আবার লুটিয়ে পড়লেন কিছু রামভক্ত। সরকারি হিসেবে এই দুদিনের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১৬ হলেও বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা অনেক। প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান অনুসারে সেদিন রামভক্তদের দেহগুলি লোপাট করে দেওয়া হয়েছিল মৃতের সংখ্যা কম দেখানোর উদ্দেশ্যে।

স্বাভাবিক ভাবেই জয় শ্রীরাম ধ্বনির দাপটে সে সময় প্রমাদ গুনেছিলেন উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতাসীন মুলায়েম সিংহ যাদব সরকার। অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল এই ধ্বনির উপর। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠে ছিল যে শেষযাত্রায় 'রামনাম সত্য হ্যায়' ধ্বনি দিয়েও পুলিশি হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে– এমন সংবাদও তখন ছাপা হয়েছিল। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয় দেশের অন্যত্রও এই ধ্বনি দিয়ে সাধারণ মানুষ বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর।

হাল আমলে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি মমতা ব্যানার্জির মতো মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যদার একজন মানুষকে কতটা রুষ্ট করে তুলতে পারে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৌলতে তা বিশ্ববাসী দেখেছে। এই ধ্বনি শুনে মেজাজ হারিয়ে বিশাল কনভয় থামিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে নিজে তেড়ে যাচ্ছেন, অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছেন, শেষে পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছেন। শুধু মমতা ব্যানার্জি একা নন, ভারতে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাদের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলে কানে গরম সিসে ঢুকে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়। এদের অনুভূতি যেন সেই ব্রিটিশদের শাসকদের বন্দে মাতরম্ শোনার মতো।

অতি সম্প্রতি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন তিনি নাকি এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শোনেননি। বাংলার সংস্কৃতিতে 'রাম' নেই। এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে নাগরিক সমিতির নামে অমর্ত্য সেনের ছবি সংবলিত 'রাম' নিয়ে দেওয়া বার্তা লেখা ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম আহ্লাদে আটখানা হয়ে শ্রী সেনের সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করে বললেন, 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে নাকি এখন মানুষ মারা হচ্ছে, অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে।' ফিরহাদের গলায় আবার যেন বন্দে মাতরম্ নিয়ে ব্রিটিশ প্রভুদের সেই পুরোনো সুর শোনা যাচ্ছে।

একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো যোগ আছে কিনা। এখনো বাঙ্গালি মৃতদেহ সৎকারের সময় 'রাম নাম সত্য হ্যায়', 'বল হরি—হরি বল' ধ্বনি দেয়। এখনো গ্রামবাংলায় রামায়ণ কথা কিংবা রামমঙ্গল গান সবচেয়ে জনপ্রিয় লোককলা। এখনো রামায়ণের কাহিনি নিয়ে যাত্রাপালা সুপারহিট হয়। রামানন্দ সাগরের রামায়ণ সিরিয়াল যখন দূরদর্শনে দেখানো হতো সেসময় অমর্ত্যবাবু দেশে থাকলে দেখতে পেতেন যে রামায়ণ দেখার জন্য রাজ্যের রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেতো, গাড়িঘোড়াও দাঁড়িয়ে পড়তো। ভারতবর্ষে এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে রামের নামে নবজাতকের নাম রাখা হয় না। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ, রাম, রামগোপাল, রামনারায়ণ নামে প্রচুর বাঙ্গালি আছেন। আধুনিক বাঙ্গালি মা-বাবারাও রামের নামে নবজাতকের নাম রাখেন। গ্রামে এখনো অনেক মানুষ আছেন যারা গণনার সময় এক, দুই, তিন চার না বলে রাম, দুই, তিন, চার অর্থাৎ 'এক' এর বদলে রাম বলেন। দুর্গাপূজো বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙ্গালিদের দুর্গাপুজো আসলে অকাল বোধন। এই অকালবোধন রামচন্দ্রই শুরু করেছিলেন। ভগবান রামচন্দ্রের অযোধ্যা আগমন উপলক্ষ্যে দীপাবলি উৎসব পালন করেছিল অযোধ্যাবাসী। সমস্ত ভারতের সঙ্গে বঙ্গদেশের মাটিতেও দীপাবলি সমান জনপ্রিয়। তুলসীদাস রামায়ণ রচনার অনেক আগে বাংলাভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, জয় শ্রীরাম শুনলে এক শ্রেণীর মানুষ এতটা ক্ষেপে যান কেন?

একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে যে এই ধ্বনি শুনলে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের চোখে ভেসে উঠে হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের দৃশ্য, অযোধ্যায় বিরাট রামমন্দিরের দৃশ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলিম তোষণের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের দৃশ্য, ভারতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর হওয়ার দৃশ্য, জাতের নামে বজ্জাতির রাজনীতি বন্ধ হওয়ার দৃশ্য, রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রার দৃশ্য, সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের দৃশ্য, দুর্নীতি মুক্ত ভারতের দৃশ্য, সুইস ব্যাঙ্কের অবৈধ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য, কালোটাকা ও বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার দৃশ্য, সারদা নারদা কাটমানি ইস্যুতে জেলে যাওয়ার দৃশ্য, এক জাগ্রত জনসমাজ তৈরি হওয়ার দৃশ্য। এক কথায় বলতে গেলে জয় শ্রীরাম শুনলেই সমস্ত ভারত জুড়ে ঔপনিবেশিক ভাবনা মুক্ত এক বিরাট নব ভারতবর্ষের দৃশ্য ফুটে উঠে। যে ভারতবর্ষে রাজনীতিকদের লুটেপুটে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, গণতন্ত্রের গলা টিপে বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকার কুপ্রথা আর চালু রাখা যাবে না, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে হিন্দুদের আর যা তা বলা যাবে না। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল যে জয় শ্রীরাম বললেই কারো উপর সাম্প্রদায়িক তকমা লেগে যেতো। এখন আর সেদিন নেই। এখন আর সত্যকে দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। নব ভারতের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। সে জন্যই জয় শ্রীরামে এত আপত্তি, এত ক্রোধ। ▮

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ান ও পড়ান

চিঠিপত্র

দলগত গুন্ডামিই জেহাদি রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

সম্প্রতি এন. আর. এস. এবং দেশব্যাপী ডাক্তারদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। পত্রটি বাবাসাহেব আম্বেদকারের একটি উক্তি দিয়ে আরম্ভ করা যাক। মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি, বিধান এবং তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাবা সাহেব বলেছেন, 'দলবদ্ধ গুন্ডামি মুসলমান রাজনীতির বৈশিষ্ট্য'।

গত ৯ জুন ৮৭ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ইমাম মহম্মদ শাহিদ মরণাপন্ন এবং অজ্ঞান অবস্থায় এন.আর.এসের জরুরি বিভাগে ভর্তি হন এবং সেখানেই তিনি মারা যান। তারপর চিকিৎসায় অবহেলার অজুহাতে ট্যাংরা থেকে দুই ট্রাক ভর্তি ২০০ জন মুসলমান গুন্ডা সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে এসে জুনিয়ার ডাক্তারদের আক্রমণ করে। ফলে পরিবহ মুখোপাধ্যায় নামে এক চিকিৎসক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে কোনো সামান্য ব্যাপারে মুসলমান গুন্ডারা যে তাণ্ডব চালায় তা কঠোর হাতে দমন করার কোনো প্রয়াস কোনো সরকারই নেয়নি সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) কয়েক বছর আগে কলকাতা প্রকাশিত একটি ইংরেজি দৈনিকে ছোটো একটি ছবি প্রকাশিত হয়। তাতে মুসলমান গুন্ডারা সেই দিন রাত থেকে পরদিন বিকাল পর্যন্ত শহর কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে তাণ্ডব চালায় তাকে ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মহড়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার ছিল।

(২) গত ২০.২.২০১২ তারিখে রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর ঢোকার পথে একটি সরকারি বাস মহম্মদ সাকিল নামে এক যুবককে ধাক্কা মারে। ফলে সাকিলের মৃত্যু হয়। এরপর ওই অঞ্চলের মুসলমানরা ট্রাম ডিপোতে ঢুকে ৪৬টা বাস, ১১টা গাড়ি এবং ২টা ট্রাম ভেঙে চুরমার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অপকর্মের পুরস্কার স্বরূপ পরিবহণ মন্ত্রী নিহতের বাড়ি গিয়ে ৫০ হাজার টাকা এবং পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন।

(৩) কিছুদিন আগে উত্তর ২৪ পরগনার একটি মুসলমান প্রধান গ্রামে বেআইনি বিদ্যুৎ চুরির হুকিং বন্ধ করতে গেলে বিদ্যুৎচোর মুসলমানদের আক্রমণে জনৈক হোমগার্ডের মৃত্যু হয়। বহু পুলিশ কর্মী ও বিদ্যুৎকর্মী মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে বাঁচেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পুলিশকে বেশি বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দেন। মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

(৪) তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ইদ্রিশ আলির নেতৃত্বে কলকাতার বুকে যে তাণ্ডব চলে তা সর্বজনবিদিত। ওইদিন কয়েক কোটি টাকার হিন্দুর গাড়ি, দোকান এবং সম্পত্তি ধ্বংস হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে সরকার মুসলমান ভোটের লোভে মুসলমান গুন্ডাদের তাণ্ডব বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই দেশপ্রেমী যুবক সম্প্রদায়কে এগিয়ে এসে এর প্রতিবাদ করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।

বাংলাদেশে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত

বাংলাদেশে বর্তমানে হিন্দু শূন্য করার একটি পরিকল্পনা চলছে। হিন্দুদের যে একটা আইন আছে তাকে পাশ কাটিয়ে আলাদা একটা আইনের বাতাবরণ সৃষ্টি করার ন্যক্কারজনক পরিকল্পনা চলছে। যাতে করে সেদশে হিন্দুদের বসবাস করার পরিবেশ হারিয়ে যায়। সনাতন পদ্ধতিকে নষ্ট করে আলাদা একটি আইনকে চাপানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য পারিবারিক বন্ধন এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করা। হিন্দু মহাজোটের অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এলেই হিন্দু আইন পরিবর্তন করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এদিকে বাংলাদেশের এনজিওগুলি বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার জন্য হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কুড়ি বছরে বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে শুধু মিউজিয়ামে দেখা যাবে। আত্মপ্রকাশ করবে হিন্দু শূন্য বাংলাদেশ। একটি ইউটিউবে দেখতে পেলাম— ইসরাত জাহান নামে অর্থনীতির এক ছাত্রী সাক্ষাৎকার নিচ্ছে ঢাকার মিরপুরের জামিয়া হোসেন ইসলামিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সাইফ উদ্দিন ইউসুফের। তাদের বক্তব্যে ফুটে উঠছে বাংলাদেশে মুসলমান ৯২ শতাংশ, হিন্দু শুধু ৮ শতাংশ। কাজেই তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। খুবই উদার বক্তব্য, যে যার ধর্ম প্রতিপালন করুক তাতে তাদের একটুও বাধা নেই, কিন্তু একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে ও তাদের বেশিরভাগ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধকে মেনে চলতে হবে। মোটকথা ইসলামকে মানতে হবে ও দেশে আচার-আচরণ সবকিছুই গ্রহণ করতে হবে। তাদের ঠারে ঠারে বুঝিয়ে দিচ্ছে। নিন্দুক তো অবশ্যই থাকবে তবে ইসলামে— তা শামিল হতে হবে তাহলে বজায় থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রকারান্তরে ইসলাম গ্রহণ কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষতার রং লাগিয়ে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

পাহাড়ি এলাকায় বঙ্গ শিক্ষা- সংস্কৃতির নির্বাসন

সম্প্রতি বিখ্যাত ভ্রমণ প্রতিষ্ঠান 'মিলনতীর্থ ট্যুরিস্ট'-এর দৌলতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তিনটে পাহাড়িয়া স্থান 'তিন চুলে', দার্জিলিং ও মিরিক যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। কলকাতা শহরে প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহ। তাই এখানকার মেঘ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি, তারপর সামান্য রোদ্দুরের পরিবেশ মনকে খুবই উজ্জীবিত করেছিল। আর ঠাণ্ডা তো হাঁড়কাপানো নয়! তাই এই ধরনের ঠাণ্ডা

শরীরে সয়ে গেছিল। এতো গেল বেড়ানোর আনন্দময় দিক্। কিন্তু যে জিনিসটা মনকে পীড়া দিয়েছে, মনকে বেদনায় ভরিয়ে দিয়েছে, সেটা তো কম নয়! ঘুরে ঘুরে মনে হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা দোকানপাট ও বাজারের লোকেরা বাঙ্গালিদের 'ট্যুরিস্ট' বা 'পর্যটকের' বেশি মনে করে না! নিজেদের ভাষাতেই সব ধরনের যোগাযোগ ও মত বিনিময় করে থাকে।

দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ি তালাবন্দি। খোঁজ নিয়ে জানলুম কখনও-সখনও দেশবন্ধুর বাড়ি দর্শকদের জন্যে খোলা হয়! হোটেল-রেস্টুরেন্টে টিভি চ্যানেলে বাংলা চ্যানেল নেই! এ ব্যাপারে কথা বললেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না! কোনো স্থানে বাংলা নেমপ্লেট নেই। বাংলা কাগজের জোগান খুবই সামান্য। যেখানে ১০০ ভাগ ট্যুরিস্ট বাঙ্গালি, সেখানে তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি এ ধরনের অবজ্ঞা ও অনীহা খুবই দুঃখ, বেদনা, পরিতাপের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল অঞ্চলে বাঙ্গলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির 'নির্বাসন' হয়েছে, যদিও এইসব স্থান 'পশ্চিমবঙ্গের' অন্তর্ভুক্ত! তাই সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতির সংশোধনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে এই পাহাড়ি অঞ্চলে ভ্রমণ 'পরিপূর্ণ' হবে।

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৭০০০৩৬।

নর্মদা নদীনামের উৎস

মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্য পর্বতের অমরকণ্টক থেকে জন্ম নিয়ে পশ্চিমে ১৩১০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরের উপসাগর কাম্বেতে মিলেছে নর্মদা নদী। পৌরাণিক কথানুযায়ী বিন্ধ্য পর্বতে তখন প্রচণ্ড খরা অনাবৃষ্টি চলছিল। দেবাদিদেব শঙ্করের নর্ম (ঘাম) থেকে জন্ম নিল নদীরূপী কন্যা নর্মদা। নর্ম থেকে নর্মদা।

পুণ্যার্জনের দিক থেকে গঙ্গার পরেই নর্মদার স্থান। এই নদীর দুই তীর জুড়ে বহু তীর্থক্ষেত্র, অসংখ্য রমণীয় বৃক্ষ, শস্যখেত, জনপদ এবং সাধু মহাত্মার সাধনকুটির অবস্থান করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে ৬৪ হাজার মন্দির। এসবের মধ্যে শিবময় রূপই প্রকাশ পায়। ভারতে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তীর মতো অনেক পুণ্যতোয়া বা পুণ্যনদী প্রবাহিত হয়ে আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় একমাত্র নর্মদা নদীকে পরিক্রমা করার ধর্মীয় রীতি আছে। পরিক্রমা বলতে নদীর দুই তটই বোঝায়। এই পরিক্রমার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪০০ কিলোমিটার। পদব্রজে সময় লাগে এক বছর। পরিক্রমার রীতিও যথেষ্ট প্রাচীন। পরিক্রমা করতে কষ্ট হলেও পরিক্রমা ছিল বা আছে অত্যন্ত প্রমোদদায়িনী ও মনোহরকারী। উল্লেখ্য 'নর্ম' শব্দের অর্থ 'ঘাম' হলেও অভিধান অনুযায়ী অন্য অর্থ প্রমোদ বা প্রমোদবিহার। 'বিহার' অর্থ ভ্রমণ বা পরিক্রমা। যে নদীকে পরিক্রমা করলে বিশেষরূপে প্রমোদ বা নর্ম পাওয়া যায় তার নাম নর্মদা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যে নদী নর্ম দেয় তার নাম নর্মদা। জয় মা নর্মদা।

—রাজকুমার জাজেদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

জয় শ্রীরামের প্রতিষেধক!

বিগত কয়েক বছর যাবৎ একটি শব্দের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। শব্দটি হলো 'জয় শ্রীরাম' সমগ্র দেশ জুড়ে সবধরনের ব্যক্তিবর্গর মধ্যে এই ধ্বনি প্রচারিত হচ্ছে। কারণ এক বা একাধিক, তা নিয়ে আমার ভাবনার বিষয় নয়। এটি অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমব্যঙ্গেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনি এই রাজ্য মুখরিত। তবে একটি আনন্দের বার্তা আছে, আমাদের ডক্টর মুখ্যমন্ত্রী এর প্রতিরোধী দু'দুটি অ্যান্টি ডোজ আবিষ্কার করেছেন। জয় হিন্দ ও জয় বাংলা, একারণেই এই রাজ্য সবকিছুতে এগিয়ে আছে। রথযাত্রার দিন প্রভু জগন্নাথকে এই প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষেধকের টিকা সকল রাজ্যবাসীকে দেওয়া হবে। পরে সমগ্র দেশ ব্যাপী এই টিকা দেওয়া কর্মসূচি চলবে। আমাদের একটা সুযোগ এসেছে এরাজ্যে আবিষ্কৃত প্রতিষেধক সারা ভারতবর্ষকে উপহার দেওয়ার। তবে ওষুধ কত কার্যকর তা বোঝা যাবে এরাজ্যে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলী।

লাল লঙ্কা খেলে আয়ু বাড়বে

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে বেশি করে লাল লঙ্কা খেলে বাড়বে আয়ু। বেশিদিন বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সবার মধ্যেই কমবেশি থাকে। আয়ু ধরে রাখতে নানান ওষুধ খেয়ে নানারকম রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। শুধু ওষুধেই সুস্থ হওয়া যায় না। ওষুধ খেলে সাময়িক ভাবে সারে ঠিকই। কিন্তু আপনি জানেন কি এর পাশাপাশি কিছু খাবারের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রোগের প্রতিষেধক? সেরকম একটি কার্যকরী খাবার হলো লাল লঙ্কা। বেশিদিন বাঁচতে হলে নিয়মিত লাল লঙ্কা খাওয়া শুরু করুন। আর বিদেশ নয়, দেশীয় গবেষকরাই জানাচ্ছেন এ তথ্য। প্রতিদিন লাল লঙ্কা খেলে মৃত্যু হার অনেকটাই কমে। এমনকী হৃদরোগ ও ব্রেন হ্যামারেজ (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ) হওয়া ও তার থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা কমে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত। আয়ু বাড়ানোর শুধু নয়, নিয়মিত লাল লঙ্কা শরীরের খারাপ কোলেস্টরল এলডিএলের পরিমাণ কমায় আর স্বাভাবিক রাখে ভালো কোলেস্টেরল এইচডিএলের পরিমাণ। লাল লঙ্কার গুঁড়ো ও মশলা প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো প্রচুর পরিমাণে। আজও সেই ধারা অব্যাহত। এই নিয়ে গবেষণা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। সেখানে প্রায় ২৩ বছর ধরে ষোলো হাজারেরও বেশি মার্কিন নাগরিককে গবেষণায় সামিল করে দেখা গেছে নিয়মিত লাল লঙ্কা খেলে সত্যিই বাড়ে আয়ু, অনেকাংশে রদ করা যায় মৃত্যুর ঝুঁকি। তাছাড়া লাল লঙ্কার আর একটি গুণ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ক্যান্সারাস উপাদান, ফলে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরিতে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

—রিংকী ব্যানার্জী,
৮৮/১, দমদম রোড, কলকাতা-৩০।



কাশ্মীরি মেয়েদের প্রেরণা নাহিদা মনজুর

সুতপা বসাক ভড়

নাহিদা নামের অর্থ সক্ষম, সমর্থ এবং ভাগ্যশালী। পাহাড়ে ট্রেকিং করতে করতে মাত্র দশ বছরের ছোট্ট নাহিদা নিজের বন্ধুকে বলেছিল তার স্বপ্ন হলো, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা মাপা এবং এই স্বপ্ন সে অবশ্যই পূর্ণ করবে। প্রায় ১৪ বছর পরে সে কেবলমাত্র এভারেস্টই জয় করেনি, বরং কট্টরপন্থী ও জেহাদিদের ফরমানের ভয় না পেয়ে নিজের স্বপ্নকে সফল করার সুযোগ খুঁজেছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের অন্য মেয়েদেরও ভয় ভেঙে এগিয়ে যাবার সাহস জুগিয়েছে।

শ্রীনগরের একটু বাইরে বসবাসকারী নাহিদা মনজুর এখন কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ মেয়ের প্রেরণা। আজ সবাই তাঁর সাহসের প্রশংসা করছে। কিন্তু এই কাজ এত সহজ ছিল না। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা মাপার থেকেও মুশকিল কাজ ছিল, এই মিশনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। বাবা মনজুর আহমেদ দোকানদার ও মা সামান্য গৃহবধূ। মা-বাবা সর্বদা নাহিদার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু অর্থের ব্যবস্থা করা ভীষণ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

অঙ্গনা

নাহিদা মিশন এভারেস্টের জন্য রওনা হবার আগে একটি আলোচনায় জানায় যে, এভারেস্টের জয় করা তার কাছে সহজ, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় দামি জিনিসপত্র জোগাড় করা খুবই কঠিন। তবে তার প্রস্তুতি পুরোপুরি ছিল। এর আগে সে হিমাচল প্রদেশের মাউন্ট ডিয়ো টিব্বা, ফ্রেন্ডশিপ পিক ও শ্রীনগরের সব থেকে উঁচু চূড়া মহাদেব চোটি পিরপঞ্জালের টাটাকুটীর শিখরে পৌঁছেছিল। নাহিদাদের বাড়ি থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে শ্রীনগরের রেল স্টেশনের পাশে টি আর সিতে ওয়াল ক্লাইম্বিং-এর জন্য সপ্তাহে কম করে তিনদিন অভ্যাস করতে যেতে হতো। একদিকে স্বপ্ন বড়ো হতে থাকে, অপরদিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব। অবশেষে নাহিদা মার্চ মাসে ক্লাউড ফান্ডিং-এর সাহায্য নেয়। ইন্টারনেটে নাহিদার আপিলের ফলে অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। নাহিদা জানায়, পর্বতারোহণ কমদামি শখ নয়। এভারেস্ট জয় করার জন্য কম করে ৩০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। নাহিদার সাহায্যে কাশ্মীরের অনেকে এগিয়ে আসেন। এতকিছু সত্ত্বেও প্রয়োজন মতো অর্থের সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তবে লক্ষ্যে অবিচল থাকলে স্বয়ং ঈশ্বর হাত বাড়িয়ে দেন। এর মধ্যে হায়দরাবাদের ট্রানজিট অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব যখন নাহিদাকে সাহায্য করে, তখন ৯ এপ্রিল সে কাঠমাণ্ডু পৌঁছে যায়। মাউন্ট এভারেস্টে বিজয় পতাকা উত্তোলনকারী কাশ্মীরের প্রথম মহিলা হবার গৌরব অর্জনকারী বিশ্বভারতী উওম্যান কলেজের ছাত্রী নাহিদা মনজুর পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ নেয় নেহরু ইন্সটিটিউট মাউন্টেনিয়ারিং-এ। এছাড়া সে রাইফেল শ্যুটিং, কবাডি ও খো-খো-তে খুব ভালো খেলোয়াড়। অনেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক জিতেছে সে।

নাহিদার বাবা মনজুর আহমেদ বলেন, ছোটো থেকেই তাঁর মেয়ে পাহাড় ভালোবাসে। আজ নাহিদার জন্য তিনি গর্বিত। অতীতে নাহিদা যখন সেখানকার পর্বতশৃঙ্গ মহাদেব চোটিতে ট্রেনিং-এর জন্য যায়, তখন ওই গ্রুপের মধ্যে সে একা মেয়ে ছিল। অনেকেই তাঁকে বলেছিল যে, তাঁর মেয়ের ছেলেদের মতো শখ কেন? মনজুর আহমেদ তখন হাসতেন। বর্তমানে ওইসব লোকেরাই নাহিদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নাহিদার বাল্যকালের বন্ধু ও ফিল্মমেকার উজ্‌মা জানায়, তারা ছোটোবেলা একই সঙ্গে হাইকিং করতে যেত। প্রথম থেকেই পাহাড়ে চড়া ও ঘোরা নাহিদার খুব প্রিয় শখ ছিল। ওই শখ ও নিষ্ঠা তাকে আজ এভারেস্টের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। নাহিদার সফলতায় উজ্‌মা খুবই আনন্দিত।

কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে নাহিদা এগিয়ে গেছে। সমাজের লোকেদের বিশেষত কট্টরপন্থী ও জেহাদিদের ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করে সে তার পথে অবিচল থেকেছে। সেজন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে সফল। নাহিদার এই প্রচেষ্টা, উদ্দীপনা প্রশংসনীয়। তার মা-বাবার উৎসাহকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। ধনী না হয়েও তাঁরা তাঁদের মেয়েকে বাধা দেননি; বরং উৎসাহবর্ধন করেছেন। তাঁদের থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার আছে। সমগ্র দেশের প্রতিটি পরিবার তাদের কন্যাদের এইভাবে উৎসাহিত করলে আমাদের দেশের চিত্র বদলে যাবে। আমরা অপেক্ষা করব সেই শুভক্ষণের! ■

With Best
Compliments
from -



A
Well Wisher

HPS



একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অটলবিহারী বাজপেয়ী, না নরেন্দ্র মোদী— প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাফল্যের নিরিখে কে কতখানি এগিয়ে? প্রায়শই এইরকম একটি প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসে। বাজপেয়ীর সঙ্গে মোদীর তুলনা করতে চান অনেকেই। অবশ্য এরকম তুলনা করায় অন্যায়ের কিছু নেই। বরং, এটিই স্বাভাবিক। স্বাধীনোত্তর ভারতে সত্তর বছরের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দুই ব্যক্তিই লালকেল্লায় ভাষণ দেবার বিরল সম্মান অর্জন করেছেন। একজন অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং দ্বিতীয়স্থানে অবশ্যই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। অটলবিহারী তাঁর পাঁচবছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকাল পূরণের পর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারেননি। নরেন্দ্র মোদী পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব করার পরও দ্বিতীয়বার আরও বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীকে পাঁচটি বছর শরিক নির্ভর হয়ে কেন্দ্রে একটি সরকার চালাতে হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীকে শরিকদের ভরসায় সরকারটি চালাতে হয়নি, এবারও হচ্ছে না। তবু নরেন্দ্র মোদীকে বারবার অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে তুলনার মুখোমুখি পড়তে হবে, কেননা অটলবিহারীর ছায়াটি অতীব দীর্ঘ। এই দীর্ঘ ছায়াকে অতিক্রম করে যাওয়া যে কোনো মানুষের পক্ষেই দুঃসাধ্য। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রসঙ্গে বলতে গেলে একটিই কথা বলতে হবে, তা হলো, দক্ষ রাজনীতিবিদ অনেকেই হন, কিন্তু স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়ক দু-একজনই হন। অটলবিহারী সেই দু-একজনের ভিতর রয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী একজন অতীব দক্ষ রাজনীতিবিদ। তাঁর সামনে একটিই শিখর ছোঁয়ার বাকি রয়েছে। সেই শিখরটির নাম অটলবিহারী বাজপেয়ী। এই শিখরটি তিনি যতদিন না ছুঁতে পারছেন, ততদিন অটলবিহারীর সঙ্গে তাঁর তুলনা টানাটি অনর্থক। ফলে, কোনো তুলনা নয়, নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক দক্ষতার এখন বিচার করতে হবে কতগুলি সাফল্যের সিঁড়ি তিনি পেরিয়ে এলেন।

তিন-তিনটি দফায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্যকে সঙ্গী করে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশেষত সঙ্ঘ পরিবার, নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বেছেছিল কেন? ওই সময় বিজেপির ভিতরেই অন্তত জনা তিনেক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, যাঁরা প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে যথেষ্ট ওজনদার নাম হিসেবেই বিবেচিত হবেন। তবু নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়ার একটাই কারণ ছিল যে উন্নয়ন এবং হিন্দুত্ব দুইয়ের সংমিশ্রণ নরেন্দ্র মোদীর মতো এমন কেউই করতে পারেননি। এবং এই দুইয়ের সমন্বয় করে নরেন্দ্র মোদী নিজের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকেও অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। সঙ্ঘ পরিবার এবং বিজেপি যে নরেন্দ্র মোদীকে বেছে নেওয়ায় ভুল কিছু করেনি— তা প্রমাণ হয়েছিল ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে। নরেন্দ্র মোদীকে



প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরে বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। কিন্তু গুজরাটের তিন-তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে উঠে আসার পথটিতে দুস্তর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর প্রথম দফার শাসনকালে গোধরায় করসেবকদের পুড়িয়ে মারা এবং তৎপরবর্তীতে গুজরাট দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিদেশি মদতপুষ্ট বিভিন্ন সংগঠন নরেন্দ্র মোদীকে আসামির কাঠগড়ায় তোলে। এমনকী বিজেপির অভ্যন্তরেও একটি অংশ মোদীর বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোদীর সে দেশে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সিবিআই তদন্তের মুখোমুখিও হতে হয় মোদীকে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মোদী কিন্তু বিচলিত হননি। বরং, গুজরাটের উন্নয়ন এবং বিকাশে তিনি মনোনিবেশ করেন। অচিরেই নিজেকে গুজরাটের বিকাশ পুরুষ হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় দফায় আরও বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মোদী প্রমাণ করেছিলেন, যাবতীয় সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়ে, জনমত নিজের দিকে সংগঠিত করার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাটি তার করায়ত্ত আছে। তা যে আছে, তার প্রমাণ তিনি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও দিয়েছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম দফার পাঁচ বছরে বিরোধীরা একযোগে তার ওপর নানাবিধ অভিযোগ আরোপ করে গেছেন। রাহুল গান্ধী তো তাঁকে 'চোর' বলতেও দ্বিধা করেনি। দেশব্যাপী এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন বিরোধীরা— যেন নরেন্দ্র মোদীকে এবার বিদায় নিতেই হচ্ছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গত করে গিয়েছিল জাতীয় এবং আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমগুলি। বিরোধীরাও এমন একটা খোয়াবে মগ্ন ছিলেন যে, এবার কেন্দ্রে জোট সরকার হচ্ছেই। এই পরিস্থিতিতে মোদীর অবিচল থাকাটা কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। বিরোধীদের নিম্নশ্রেণীর অভিযোগের সুদৃঢ় উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে মোদী অবিচলিতভাবে একটি দাবি করেছিলেন— এবারও আমরা ফিরছি। এবং আর ভালোভাবেই ফিরছি। ফল বেরনোর পর দেখা গিয়েছে, বিরোধীদের সব আশা হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে এবং মোদীর দাবির যথার্থতা প্রমাণ হয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন প্রমাণ করেছে, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী নামের ভদ্রলোক জানেন তাঁর নামটি এখনো কেমন আবেগের সৃষ্টি করে জনমানসে। জনগণের মন বোঝার ব্যাপারে যে তিনি অদ্বিতীয় এক রাজনীতিবিদ— তাও প্রমাণ করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির আর একটি অকাট্য প্রমাণ তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধকরণ। নরেন্দ্র মোদী জানেন, কংগ্রেস-বামপন্থী বা সমাজবাদীদের মতো মুসলমান তোষণের রাজনীতির পথটি তাঁর বা বিজেপির নয়। আবার একথাও সত্য, ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে মুসলমান সমাজের এক অংশের সমর্থনটিও ভীষণভাবেই জরুরি। তোষণের রাজনীতিতে পা না বাড়িয়েও সেই সমর্থনটি আদায় করা যায় তা নরেন্দ্র মোদী দেখিয়েছেন। তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমান সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশের, বিশেষত মুসলমান মহিলাদের সমর্থন জিতে নিয়েছেন তিনি। স্বাধীনোত্তর ভারতে তোষণের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এতবড়ো বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আর কেউ নিতে পারেননি। এমনকী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পক্ষেও এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী এটাও প্রমাণ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবেগ বা হঠকারিতার রাজনীতিকে তিনি প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। নন বলেই অতি উগ্র অপরিণামদর্শী কিছু তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিশৃঙ্খল কাজকর্মের রাশ ধরার কঠোর বার্তাও তিনি দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এই ধরনের অপরিণামদর্শী কাজকর্ম আদতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এরই পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী এও প্রমাণ দিয়েছে সনাতন হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট। নরেন্দ্র মোদীই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি বাংলাদেশ গিয়ে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন। এতে বার্তাটি পরিষ্কার হয়েছে। নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে যে তিনি রয়েছেন— সেই বার্তাটি বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন সহজেই।

নরেন্দ্র মোদী জানেন, সর্বোচ্চ যে শিখরটি তাঁকে ছুঁতে হবে, তাঁর নাম অটলবিহারী বাজপেয়ী। এও জানেন, এই শিখরটি ছোঁয়া

এত সহজ কাজ নয়। শিখরটি ছোঁয়ার জন্য ধাপে ধাপে শীর্ষে ওঠার পথটিও এবার বেছে নিয়েছেন মোদী। বলেছেন— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'।

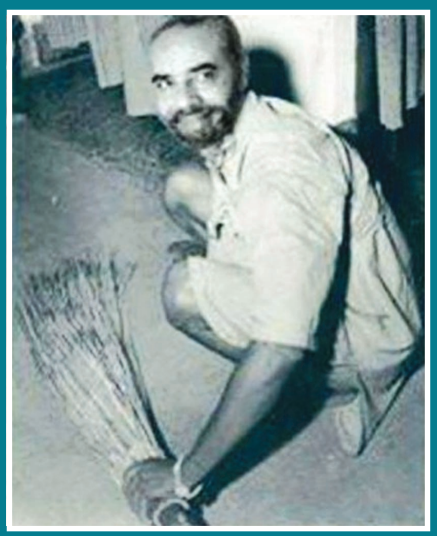
মোদী জানেন, দ্বিতীয় দফার এই প্রধানমন্ত্রিত্বে তাঁকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাঁকে শুধু বিজেপির প্রধানমন্ত্রী হলেও চলবে না। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি সব দল, সব মতের ঊর্ধ্বে ওঠা এক নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্যই সব কা সাথ, সবকা বিকাশের নীতিতে তিনি এবার আগ্রহী। সেই সঙ্গে এও বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলীয় রং বিচার না করেই রাজধর্ম পালনেও তিনি আগ্রহী। যে কারণেই তাঁর দলের প্রতিপত্তিশালী কোনো নেতার পুত্র অন্যায় করে ফেললে তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেও দ্বিধা করছেন না।

প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রিত্ব কালেই বোঝা গিয়েছিল, নরেন্দ্র মোদী একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিবিদ। আর পাঁচজনের সঙ্গে ঠিক এক সারিতে বসানো যাবে না। তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধের মতো সাহসী সিদ্ধান্ত তিনিই নিতে পারেন। তিনিই নিতে পারেন নোটবন্দির মতো কঠোর সিদ্ধান্ত। নোটবন্দির সিদ্ধান্তের পিছনে অসম্ভব রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে জেনেও, পপুলিস্ট রাজনীতির পথে পা বাড়াননি নরেন্দ্র মোদী। ঝুঁকি নিয়েও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন, তাঁর সিদ্ধান্তে কোনো ভুল ছিল না। পাকিস্তানি জঙ্গি হামলার পর দেশবাসীর আবেগকে মর্যাদা দিয়ে সার্জিকাল স্ট্রাইক করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, শত্রুর মুখে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার রাজনৈতিক যোগ্যতাও তাঁর রয়েছে।

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর দ্বিতীয় ইনিংস সবেমাত্র শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি আরও স্থিতধী। সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা এক বিকাশ পুরুষ। এখন আরও কিছুটা পথ তাকে হাঁটতেই হবে শিখর স্পর্শ করার জন্য। ■

এন ডি থেকে নরেন্দ্র মোদী

১৯৯১ সাল। গুজরাটের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব গুরুচরণ সিংহ মুম্বাই যাচ্ছেন। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উল্টোদিকের আসনেই বসে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। বেশ আঁটোসাটো চেহারা। গালের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নিখুঁতভাবে ছাঁটা। পরনে পাজামা আর কলারওলা হাফ হাতা সুতির কূর্তা।



সঙ্ঘের প্রচারক জীবনে কার্যালয়ে কর্মরত মোদী।

না, পরিচয় করার আগ্রহ দেখাননি গুরুচরণ সিংহ। কারণ অপরিচিত ওই সহযাত্রী তখন মন দিয়ে পড়ছেন স্বামী বিবেকানন্দের একটি বই। কয়েকটা স্টেশন পার হবার পরই প্রাক্তন ওই আই এ এস অফিসারের বিস্মিত হবার পালা শুরু। যেখানে ট্রেন থামছে, জানালার কাছে ভিড় জমছে ফুলের মালা হাতে দলবদ্ধ মানুষের। সিংজী মনে মনে ভাবছেন, এর নাম ভারতবর্ষ। যত মানুষ, তত নেতা!

মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছে সিংজী এবার সত্যিই হতবাক। এক বিশাল জনতা 'মোদীজী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর করে তুলেছে স্টেশনের প্লাটফর্ম। মালার পাহাড় আর পুষ্পবৃষ্টির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছেন মোদী। দুপাশে বিজেপির পতাকা হাতে সারবদ্ধ মানুষ। গুরুচরণ সিংহ মনে করার চেষ্টা করলেন, কে এই মোদীজী? বিজেপির নেতা-সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু গুজরাটের কি? কই, এতদিন গুজরাটে শীর্ষস্থানীয় আমলার দায়িত্ব পালন করলেন, এ নামটা তো কখনও শোনেননি!

১৯৬২-র এক ভোরবেলা। শীতের কুয়াশায় মুড়ি দিয়ে ছোটো স্টেশন বড়নগর। একটা ট্রেন এসে থামল। কয়েকজন ভাররী সৈন্য বেডিং কাঁধে পা রাখল স্টেশনে। কারও মাথায় ব্যান্ডেজ, কারও বা হাতে। ছুটে এল বছর বারোর এক কিশোর। হাতে তার গরম চায়ের কেটলি, মাটির ভাঁড়। কেটলি থেকে ভাঁড়ে চা ঢেলে এগিয়ে দিল সৈন্যদের দিকে। ওঁরা দেখছেন। পয়সা না নিয়েই চলে যাচ্ছিল কিশোরটি। সেনাদের একজন পিছন থেকে ডাকল— "এ লেড়কা, চায়ে কা পয়সা লেকে যাও।" ছেলেটি ফিরে এল। নরম কণ্ঠে বলল— "নেহী লাগে গা।'

—কিঁউ?

—বোল দিয়া, নেহী লাগে গা।

—কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা?

—এনডি—নরেন্দ্র—নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

আর দাঁড়ায়নি কিশোরটি। গরম চা নিয়ে তখন সে ছুটছে প্লাটফর্মের অপর প্রান্তে।

দুটো ছবি পাশাপাশি ধরলে কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় নির্জন বড়নগর স্টেশনের চা-বিক্রেতা এক কিশোর। আর কোথায় মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে তারই নামে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখর আকাশ-বাতাস। ■



মোদীর প্রশাসনিক মন্ত্র

‘ন্যূনতম সরকার সর্বাধিক সুশাসন’

সুজিত রায়

২০০২ সালের ১২ ডিসেম্বর গুজরাটের ৬১.৫ শতাংশ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে ১২৭ আসনে জয়ী হয়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য বসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর তখ্‌তে। ঠিক সেরকম সময়েই ঘটেছিল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা যা ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল এক নতুন ধরনের মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি আমলাদের রাজনৈতিক চাপে রাখেন না। সব দপ্তরের সচিবদের ডেকে ডেকে বলেছেন—“প্রকল্প রূপায়ণের স্বাধীনতা আপনাদের। রূপায়ণের দায়িত্বও আপনাদের। সরকারের দায়িত্ব রসদ সংগ্রহ করা। সে দায়িত্বটা আমার।” বলছেন—“আপনারা স্বাধীনভাবে কাজ করুন, কাজ করতেই হবে। শাস্তির ভয় পাবেন না। আমি কাউকে শাস্তি দেব না।”

মোদীজী যখন চাইছেন--- সরকারি অফিসাররা কাজ করুন আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মানুষকে তৃপ্ত করতে, সেরকম সময়েই তাঁর কাছে রিপোর্ট এল— একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা নানাভাবে তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। দপ্তরের কাজে কোনও গতি নেই।

মোদীজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন— ‘আপনার অসুবিধাটা কোথায়?’ ওই অফিসার বললেন, তাঁকে যে দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে— সেটা তাঁর পছন্দের কাজ নয়।

—কোন কাজ আপনার পছন্দ খোলাখুলি বলুন।

—আমি গানবাজনা পছন্দ করি।

শুনে একটু চমকে গেলেও, মোদীজী রেগে যাননি। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—“বেশ, আপনি যেটা ভালোবাসেন সেটা করুন।”

সরকারিভাবে গরিব ছেলেমেয়েদের গান বাজনা শেখানোর জন্য একটা স্কুল খোলা হলো। আর ওই অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো— গান শেখানোর। কয়েকমাস বাদে দেখা গেল, ওই অফিসার গান বাজনার পাশাপাশি তাঁর দপ্তরের দায়িত্বও সমান পারদর্শিতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।

প্রশাসক নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এটাই। কোনো চাপ নয়। তিনি বিশ্বাস করেন স্বামী বিবেকানন্দের সেই ভাবনায়— ‘চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতার ওপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি এবং কল্যাণ।’ তাই তিনি লাল ফিতের গেরোয় অবিশ্বাসী। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবার পরও সরকারি অফিসারদের বলে দিয়েছিলেন--- ছুটি নেবেন। কিন্তু কাজের পর। কাজ শেষের আগে নয়। তাঁর কণ্ঠে গমগম করে ওঠে—“In Government, the major problem

in our system is that the the mentality is one of the secrecy. One person who is sitting at the table thinks that no one should know what he is doing. All is compartmentalised, psychologically and physically. I wanted to change this environment. মোদীজীর কাছে এটাই প্রশাসনিক সংস্কার যে আমলাতন্ত্র মানে মুক্তমন, মুক্তচেতনা। গোপনীয়তা এবং সংস্কারের নিগড়বদ্ধতা নয়। আবার মন্ত্রী বা সরকারের চাকরতন্ত্রও নয়। আমলা মানে জনগণের সেবক। মন্ত্রী বা সরকারও তার বেশি কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী আসীন হবার পর যেসব পুরনো আমলারা ঘর গোছাতে শুরু করেছিলেন অন্য কোথাও অন্য কোনখানে যেতে হবে ভেবে, তাঁদের চমকিত করে মোদীজী তাঁদের স্বস্থানেই রেখে দিলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'যে যেখানে ছিলেন, থাকবেন'— এই নীতি মেনেই। মোদীজী তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের একটি উক্তি : 'Gentlemen, there are no bad soldiers. only bad officers.' প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে এক নতুন আঙ্গিক, এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন মোদীজী— 'সামনে থেকে নেতৃত্ব দাও। বলির পাঁঠা খোঁজার চেষ্টা কোর না।' সাধারণ গুজরাটকে ভাইব্র্যান্ট গুজরাটে পরিণত করা, নিজেকে 'বিনাশ পুরুষ'-এর তকমা থেকে মুক্ত করে 'বিকাশ পুরুষ'-এ পরিণত করা, গোটা ভারতবর্ষকে চমকিত, মুগ্ধ এবং স্তব্ধ করে দিয়ে সমস্ত বিরোধী শক্তির অপপ্রচারকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ২০১৪ এবং ২০১৯-এর নির্বাচনে 'মোদী ম্যাজিক' প্রতিষ্ঠার পিছনেও রাজনৈতিক কৌশলের চেয়েও অনেক বেশি কাজ করেছে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর এই প্রশাসনিক চিন্তাধারা এবং ভূমিকা। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ২০১৪ এবং ২০১৯-এও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার উপহার দেওয়া মোদী সরকার গতানুগতিকতাকে 'দূর হটো' বলে নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে এগোতে চায়। সেই চিন্তাভাবনার অভিমুখ মূলত দুটি : স্বচ্ছ ঘুষমুক্ত মেদমুক্ত প্রশাসন আর জাতীয়তাবোধের সচেতনতা। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রশাসনের সময় নেই সময় নষ্ট করার। দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার। আর সেজন্যই বুঝি একদা এঁদো গলি, সুতোকল আর কাপড়ের মালখানার গুজরাটে মোটরগাড়ির কারখানা করে রতনলাল টাটার মতো ব্যক্তিত্বও বলতে পারেন— 'আমি আমার ঘর খুঁজে পেয়েছি।' এখন ভারতবর্ষ অপেক্ষমাণ এক নতুন ছাদের যে ছাদ ভারতবর্ষকে পরিচিত করবে ২০৩০ সালের মধ্যেই বিশ্বের প্রথম সারির তিনটি অর্থনৈতিক দেশের একটি হিসেবে।

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর রাজনৈতিক স্লোগান যেমন 'সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস' তেমনই তাঁর প্রিয় প্রশাসনিক স্লোগান হলো--- 'Minimum Government, Maximum Governance।' গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৩ বছরে এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরে মোদীজী এটাই করেছেন— মানুষের জীবন থেকে সরকারের ভূমিকা কমিয়ে এনে প্রশাসনের ভূমিকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনীকার অ্যান্ডি মারিনোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মোদী বলেছেন— ''When I first took charge (in Gujrat), the problem I was facing there was the same problem my country is facing today. The problems ane not new. The problems were there in Gujrat. The confidence level was very low.'' প্রশাসক হিসেবে তিনি তাই বারবার জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জনের কথা বলেন।

সমীর কোচার তাঁর 'Modinomics : Inclusive Economics, Inclusive Governence' গ্রন্থে লিখেছেন : ''Modi's vision of development has three simple pillars. First, higher investment leads to higher growth. Second, progressive policies lead to greater investments. Third, all stake holders should be encauraged for state and national good without the baggage of isms.'

তাই মোদীর প্রশাসন সব মতবাদের ছত্রছায়াবিহীন এক অনন্য প্রশাসন যা বিশ্বাস করে সেই উন্নয়নে পঞ্চামৃতর— জলশক্তি, জনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, উর্জাশক্তি আর রক্ষা শক্তিতে। এবং ওই বিশ্বাসে দুর্নীতির কোনও জায়গা নেই। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই। জনশক্তিই তাঁর মূল চালিকাশক্তি আর জনশক্তির কাছে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনই তাঁর প্রশাসনিক কর্মধারা। তাই মোদীর প্রশাসন সম্বন্ধে শেষ কথাটা বোধহয় অনেক আগেই লিখে গেছেন মোদীজীর আর এক জীবনীকার নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Narendra Modi 'The Man, The Times'-এ। তিনি জ্যোতিষীর মতোই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন— 'Modi makes business a pleanere and delivers on his promises. And perhaps like many other theories this will go down in history as one of his achievements.' ■







মোদী সরকারের সাফল্য বিস্ময়কর

অভিমন্যু গুহ

পাঁচ বছর আগে বিপুল ভোটে জিতে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে বিজেপি সরকার। বিজেপির নির্বাচনী প্রচার সমিতির প্রধান নরেন্দ্র মোদী ভারতবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সুশাসনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। পরবর্তী পাঁচ বছর ভারতবর্ষ দেখেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়ন ঠেকাতে বিরোধীদের কী অকল্পনীয় প্রচেষ্টা, বহিঃশত্রুদের থেকেও এমন বিরোধিতা আসে না যতটা এসেছিল বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে। যেন তেন প্রকারেণ দিল্লির দখল করা ছিল যাদের মূল লক্ষ্য। ভারতবাসী এদের সর্বতো ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন বোঝা গেল পাঁচ বছর পরে ২০১৯-এ। নির্বাচনী ফলাফল বলে দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বিগত ৫ বছরে আরও কত বিপুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। আজ পরাজিত, হতোদ্যম, ব্যর্থ বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে দেশপ্রেমের জিগিরেই নাকি বিজেপি এই বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। বিরোধীরা যদি নিজেদের ঘোরতর দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করেন ভারতবাসীর কাছে, শুধুমাত্র তখত দখলের নেশায় মত্ত হয়ে, তবে ভারতবাসী তাঁদের বর্জন করবেনই। কিন্তু গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী যে একের পর এক সামাজিক প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে সফল হয়েছেন, তাতে বিজেপির ভোটের লাভটা বড়ো কথা নয়। ভারতবর্ষ মোদীর এই চেষ্টায় সামাজিক ভাবে আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, যে শক্ত ও সমর্থ ভারতবর্ষ আপামর দেশবাসীর স্বপ্ন,তাও এর ফলে বাস্তবায়নের পথে। আর সেই কারণেই মোদী সরকারের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

এই কথা বোঝা দরকার সামাজিক প্রকল্পের রূপায়ণ কর্মসূচি কোনও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা হতে পারে না। এর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা যেমন প্রয়োজন, তেমন দূরদৃষ্টিও।

মোদী সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলি প্রমাণ করছে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই সামাজিক উন্নয়নে তাঁদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। মোদীর ক্ষমতায় আসার প্রথম তিন বছরে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের চালচিত্রটা দেখলেই তা মালুম হয়। ২০১৪-র ২৮ আগস্ট চালু হয়েছিল জনধন যোজনা। লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব ভারতবাসীকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা। ওই একই দিনে চালু হয়েছিল 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন', লক্ষ্য ভারতীয় যুবক-যুবতীদের প্রতিভা খুঁজে বের করা। ২৮ সেপ্টেম্বর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সূত্রপাত হয়, যার লক্ষ্য দেশের শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা।

২০১৪-র ২রা অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূত্রপাত, গান্ধীজীর জন্মদিনকে স্মরণে রেখে। নির্মল ভারত গঠনের দিকে আরও একধাপ এগোনোর প্রক্রিয়া। ২০১৪-র ১১ অক্টোবর ভারতবর্ষের গ্রামের সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন প্রকল্প সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা। ১৬ অক্টোবর ঘোষিত হলো আরও প্রকল্প, শ্রমজীবী মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে, শ্রমিক জয়তে যোজনা। ২০১৫ সালের শুরুতে ২২ জানুয়ারি শুরু হলো 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। লক্ষ্য, ছাত্রী ও যুবতীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও শিক্ষিত করে তোলা। তার আগে ২১ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল হৃদয় পরিকল্পনা, লক্ষ্য ছিল ভারতের অন্তর্গত বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা।

৮ এপ্রিল শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা

যোজনা! ছোটো ব্যবসায়ীদের ৫০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণদানের প্রস্তুতি। পয়লা মে ঘোষিত হলো উজ্জ্বলা যোজনা, বাড়ি বাড়ি কম দামে এল ই ডি আলো পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা। ৯ মে চালু হলো অটল পেনশন যোজনা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের জন্য অবসরকালীন ভাতা পরিকল্পনা। ওই দিনেই ঘোষণা হয় প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বিমা যোজনা। ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি লোকদের জন্য ২ লক্ষ টাকার জীবনবিমা প্রকল্প, ৩৩০ টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে। ওই একইদিনে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার সূত্রপাত। বছরে মাত্র ১২ টাকার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী মানুষদের জন্য দুর্ঘটনা বীমা। ২০১৫-র ২৬ জুন এল স্মার্ট শহর প্রকল্প, যার লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে দেশের একশোটি শহরকে স্মার্ট শহর, অর্থাৎ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত যুগপোযোগী করে গড়ে তোলা। পাশাপাশি ওইদিনই ঘোষণা হলো আমৃট প্রকল্পের, যার মাধ্যমে লক্ষাধিক মানুষের বসবাসযুক্ত পাঁচশোটি শহরের উন্নয়ন কর্মসূচি ২ জুলাই ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের সূত্রপাত। আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের প্রতিফলন এতে দেখা যায়। ৫ নভেম্বর স্বর্ণ পুনর্ব্যবহার প্রকল্পের সূচনা হয়। ঘরে বা ব্যাঙ্কের লকারে থাকা অব্যাবহৃত সোনাকে অর্থকরীভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা। একই সঙ্গে চালু হয়েছিল সার্বভৌমিক স্বর্ণ বন্ড যোজনা।

২০১৬ নতুন বছরের শুরুতে ১৬ জানুয়ারি 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচি, নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে নেওয়া হয়। ২০১৬-র ৪ মার্চ সেতু ভরতম্ যোজনা, জাতীয় সড়ক ও রেলওয়ে ক্রসিংয়ে সেতু নির্মাণ করে যাতায়াতের পথ সুগম করা ও দুর্ঘটনা এড়ানো ছিল এই কর্মসূচির লক্ষ্য। ৫ এপ্রিল চালু হলো 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া', তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের শিল্পোদ্যোগের জন্য ১ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা। ১৪ থেকে ২৪ এপ্রিলের মধ্যে সূচনা হলো 'গ্রামোদয় সে ভারত উদয়' প্রকল্পের। লক্ষ্য দেশের উন্নয়নের জন্য গ্রামোন্নয়নে জোর দেওয়া। ১ মে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা প্রকল্প যার লক্ষ্য দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের ঘরে ঘরে আলো পৌঁছে দেওয়া। ৭ জুলাই নির্মল গঙ্গা যোজনার মাধ্যমে গঙ্গার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার প্রকল্প। সব মিলিয়ে ক্ষমতায় আসার বছর দু'য়েকের মধ্যেই মোদী সরকার তার সামাজিক প্রকল্পগুলির কর্মসূচি হাতে নিয়ে ফেলে।

এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। ভারতের মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে যে কোনও সামাজিক পরিকল্পনাই দীর্ঘমেয়াদি সময়ের ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন। কারণটা সবাই বুঝতে পারবেন, তা হলো অর্থের অপ্রতুলতা। কিন্তু এই সামাজিক প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে আর্থিক সমস্যা ঘুচবে, সমৃদ্ধি ও শান্তি সূচক বৃদ্ধি পাবে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির আসনে অধিষ্ঠিত। মোদী সরকারের সুচারু পরিকল্পনা, দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে যেমন সাবলম্বন এনে দিয়েছে, তেমন ভারতবর্ষের সামাজিক সমৃদ্ধির দিকেও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

যত দিন গেছে তত একের পর এক সামাজিক প্রকল্প ভারতবাসীকে উন্নততর জীবনের সন্ধান দিয়েছে। যেমন ধরা যাক প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কথা। ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্প অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ গরিব ও হতদরিদ্র পরিবারের ৫০ কোটি মানুষ এর ফলে উপকৃত হবেন। ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি বলছে, এ বছরের মে মাস পর্যন্ত প্রায় ২৭ কোটি মানুষ এই প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সূত্রপাত হয়েছে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে। এজন্য বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ৮৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা। উপকৃত হবেন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ কোটি কৃষক। প্রথম পর্যায়ে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ২ কোটি ৬০ লক্ষ সব মিলিয়ে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষককে আপাতত সরাসরি নিয়ে আসা হবে এই প্রকল্পের আওতায়, তেমনটাই জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক। ক্ষমতায় আসার পরই চালু করা মোদীর কিছু প্রকল্পের দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক। ২০১৬-র মে মাসে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রাথমিক ভাবে ৮ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছনো। এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। রাইসের করা একটি গ্রামীণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ৮৬ শতাংশ মানুষের মতে স্টোভে রান্নার থেকে কাঠের উনুনেই তাঁরা রান্না করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য। আবার ৩২ শতাংশ মানুষ বলছেন কাঠের উনুনের রান্না তাঁদের অনেক বেশি স্বাদু মনে হয়। ৩৬ শতাংশ মানুষ এখনও উনুনেই রাঁধেন। ২৭ শতাংশ রান্নার গ্যাসে। আর ৩৭ শতাংশ গ্যাস ও উনুন— দু'টিতেই রান্না করেন। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-য় পরিবার পিছু গ্যাস দেওয়া হয়েছে বছরে ৩.৪টি, প্রকল্প-বহির্ভূত পরিবার পিছু বছরে গ্যাস নেওয়ার পরিমাণ ৭.৩টি। একটা কথা আমাদের বোঝা দরকার, যে কোনও সামাজিক পরিবর্তনেই সময় প্রয়োজন। মা-বোনেদের উনুনে তেতে-পুড়ে রান্না করার কষ্টের হাত থেকে রেহাই দিতে ঘরে ঘরে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মসূচি কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করেছিল, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দেশবাসীর সচেতনতাই পারতো তাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে, যা একদিনে হয় না।

এবার ভোটের প্রাক্কালে মোদী বলেছিলেন, পাঁচ বছরে দেশ এতটা পাল্টে যাবে ভাবিনি। নিন্দুকেরা হেসেছিল। কিন্তু ভারত ভাগ্যবিধাতাও বোধহয় পাল্টা মুচকি হেসেছিলেন। কারণ এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় যে ধৈর্য স্থৈর্যের প্রয়োজন হয়, তার এক শতাংশ বিরোধীরা বিগত দিনে সরকারে থাকার সময় দেখাতে পারলে দেশকে এতটা দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হতো না। মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প স্বচ্ছ ভারত মিশনে ১০ কোটি গৃহ-শৌচালয় তৈরি হয়েছে এখনও পর্যন্ত, যার মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় ৯ কোটি ২৮ লক্ষ, শহরে ৫৮ লক্ষ। এছাড়া জন শৌচালয়ও তৈরি হয়েছে ৪ লক্ষ ৮০ হাজারটি। এ তো মামুলি পরিসংখ্যান মাত্র।

রাইসের একটি তথ্য অনুযায়ী এসব সত্ত্বেও মানুষের অভ্যেস বদলানোই আপাতত সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ, গ্রামের ৪৩ শতাংশ মানুষ আজও খোলা স্থানে শৌচকর্ম করেন। শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও ২৩ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ তা ব্যবহারে এখনও স্বচ্ছন্দ নন। সুতরাং যে প্রকল্পের বয়স ছ' বছর হয়ে গেল তবু মানুষের সচেতনতা আনা কতটা কষ্টসাধ্য তা বোঝাই যাচ্ছে ওপরের পরিসংখ্যানে। মোদী সরকার ভোটের স্বার্থে কোনও কিছু করেননি। তার সমস্ত লক্ষ্য ২০২০, ২০২২ বা ২০২৫ সালকে কেন্দ্র করে। ভোটমুখী হলে তা ২০১৯ অবধি হতো বড়োজোর। তাই রাজনৈতিক গিমিক নয়, দেশের স্বার্থেই মোদী সরকারে সামাজিক অবদানকে বিবেচনা করা উচিত। তিন তালাকের ক্ষেত্রে মোদী সরকারের পদক্ষেপকেও এই অভিমুখ থেকে দেখা দরকার। একইভাবে স্মার্ট শহর প্রকল্পে মোদী-সরকারের স্থায়ী পদক্ষেপ ভারতকে জগৎসভায় গুরুত্বপূর্ণ আসনে অভিষিক্ত করেছে। ■

সংবাদমাধ্যমের বিষনজরে মোদী

১৯৮৬ সালে আমেদাবাদ পৌর নির্বাচনে প্রথমবার জেতে বিজেপি এবং এই জয়ের অন্যতম রূপকার ছিলেন নরেন্দ্র মোদীই। সে সময় সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী ও অচ্যুত যাজ্ঞিক মোদীর একটি সাক্ষাৎকার নেন। আশিস নন্দী লিখেছিলেন, ''আমি কেঁপে উঠেছিলাম। সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে এসে আমি যাজ্ঞিককে বলেছিলাম, এই প্রথম আমি ধ্রুপদী এক ফ্যাসিস্তের সঙ্গে কথা বললাম, সম্ভবত এক ঘাতক, সম্ভবত ভবিষ্যতের এক গণহত্যাকারীর সঙ্গে আমি কথা বললাম। —ফ্যাসিস্ত শব্দটা আমি গালিগালাজ হিসেবে ব্যবহার করছি না, মতাদর্শ এবং সেই মতাদর্শকে প্রেক্ষাপটে রেখে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের ধরন যুক্ত করেই বলছি।'' সাংবাদিক নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় মোদী সম্পর্কে তাঁর প্রায় গবেষণাগ্রন্থ 'নরেন্দ্র মোদী : দ্য ম্যান, দ্য টাইমস' গ্রন্থে একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রশ্ন করা যাবে না, এটাই মোদীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একথা মোদীর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখছেন : ''গুজরাটে ঘোরার সময় এটি সবচেয়ে ভালোভাবে সামনে এসেছে। এই বইয়ের জন্য গবেষণা করতে গিয়ে আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলছি, সকলেই একটাই অভিমত দিয়েছেন— নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অন্য কোনও ধারণার কথা মোদী শুনতে পছন্দ করেন না। স্বৈরতন্ত্রী, তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাউকে উত্থানের সুযোগ দেন না যাতে কেউ তার সামান্যতম বিপদও ঘটাতে না পারে। অধিকাংশ মানুষই বলেছেন, তিনি মূলগতভাবে একটা নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন। এটা তাঁর চরিত্রের অন্যতম ত্রুটি। আর ভোগেন বলেই তাঁর চারপাশের মানুষজনদের কাছ থেকে তিনি অনুগত্য দাবি করেন, আনুগত্য অর্জনও করেন। আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের অধিকাংশই একটা ব্যাপারে একমত যে 'মোদী সবচেয়ে কম গণতান্ত্রিক নেতাদের



অন্যতম।'

তৎকালীন জি নিউজ চ্যানেলে কর্মরত সাংবাদিক সুধীর চৌধরী ২০১২ সালের গুজরাট গণহত্যার পর গান্ধীনগরের সার্কিট হাউসে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দশ মিনিটের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন মোদীর বক্তব্যের একটি অংশ : 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি চেন চল রহি হ্যায়'। বাঙ্গলায় যার অনুবাদ করা হয়েছিল 'সব ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া হয়। সেটাই চলছে।' অর্থাৎ বোঝানো হয়েছিল, গুজরাটের গোধরায় ৫৯ জন হিন্দু করসেবককে ট্রেনের কামরায় পুড়িয়ে মারার প্রতিক্রিয়াই হলো ২০১২-র দাঙ্গা।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত বিখ্যাত লেখিকা এবং সমাজকর্মী অরুন্ধতী রায় তখন প্রচার করেছিলেন, এক অন্তঃসত্তা মুসলমান মহিলাকে খুন করে তাঁর পেট চিরে জঠরস্থ ভ্রূণটিকে বার করে টুকরো টুকরো করে চিরে রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এই একচেটিয়া প্রচারগুলি কতটা ঠিক আর কতটা বেঠিক তা গবেষণার সময় বোধহয় গবেষকরা পাননি। এবং সেই সম্পূর্ণ একপেশে মতামত ও তথ্যগুলিকে সামাল দিতে হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর শক্ত চোয়াল, নির্নিমেষ চাহনি এবং ক্ষুরধার মস্তিষ্কের তীব্র ঝলকানি দিয়েই। যেমন সুধীর চৌধরীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনি। সেদিনের সাক্ষাৎকারে আসলে মোদী কী বলেছিলেন? দেখে নেওয়া যাক। গোটা বাক্যটি ছিল এরকম : 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।' ('A chain of action–reaction is going on. We want that both should stop– neither action, nor reaction should continue.' কিন্তু প্রচার হয়েছিল শুধু প্রথম বাক্যটিই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই।

অরুন্ধতী রায়ের কাহিনি আরও মারাত্মক। অভিযোগ নিয়ে তদন্তের সময় যখন কোনও প্রমাণই মিলল না, তখন তদন্তে সাহায্য করার জন্য পুলিশ অরুন্ধতী রায়ের সাহায্য চান। তিনি তখন তাঁর আইনজ্ঞদের দিয়ে উত্তর পাঠান, পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাঁকে জোর করে পুলিশের ডাকে সাড়া দেওয়াতে পারবে না। এমনকী তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন— দাঙ্গায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গুলবার্গ আবাসনে এহসান জাফরির সঙ্গে তাঁর দুই মেয়েকেও খুন করা হয়েছে। পরে আমেরিকা নিবাসী জাফরি-পুত্র চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, এহসান জাফরির কন্যা সন্তান একটিই এবং তিনি আমেরিকায় তাঁর কাছে নিরাপদেই আছেন। অরুন্ধতী রায় তখনও নির্বাক থেকেছেন।

সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার কি আদৌ কোনও যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবতা আছে। যদি সত্যিই তাই হতো, তাহলে 'ধ্রুপদী ফ্যাসিস্ত' নরেন্দ্র মোদী তাঁর আমলাদের ডেকে বলতেন না, 'Don't bother about punishment, in my office there will be no punishment. You have to take risk, you have to perform. If any problem arises, I am responsible." বলতেন না," ''Gentlemen, there are no bad soldiers, only bad officers." ■



‘শিবাখ্যা’— দুর্গারই এক নাম

রূপশ্রী দত্ত

বর্ধমানের আউশগ্রামের অন্তর্গত অমরাগড়ের মহেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী দেবী দুর্গা ‘শিবাখ্যা’র বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। এই অঞ্চলে গোপ সম্প্রদায়ের আধিক্য ছিল বলে স্থানটি গোপভূমি নামেও পরিচিত ছিল।

জনশ্রুতি এই যে, সৌরাষ্ট্র থেকে এক রাজপরিবার তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে পরিবারের এক মহিলা পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু সন্তানের কোনও চেতনার লক্ষণ না দেখে, মৃত ভেবে তাকে ত্যাগ করে চলে যান। ঈশ্বরের কৃপায় সেই সন্তান কিছুক্ষণ পরেই সুস্থ হয়ে কাঁদতে শুরু করলে, বনের এক মা-ভাল্লুক তাকে প্রতিপালন করে। পরে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ সে স্থান দিয়ে যাবার সময় দেখে, মানব শিশুকে ভাল্লুক মাতা বেষ্টন করে আছে। ভাল্লুক মাতা সরে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ সেই শিশুকে নিয়ে নিঃসন্তান ব্রাহ্মণীর কোলে তুলে দেন। ভাল্লুক মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ছেলের নাম হয় ভল্লুপদ। সে ছেলে বড়ো হয়ে রাজা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম ভাল্কী। তাঁর প্রপৌত্র রাজা মহেন্দ্রই ওই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

মহেন্দ্রই স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন দেবী শিবাখ্যাকে এনে নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে। কাটোয়ার খেজুরডিহি গ্রামের জমিদার জগৎ সিংহের গৃহ হতে বলপূর্বক দেবী দশভুজাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবী দুর্গা এখানে ‘শিবাখ্যা’ নামেই পূজিত হন।

‘শিবাখ্যা’ নামের উৎস সন্ধানে বলা যায় তিন পুতুলের দেবী দুর্গার একেবারে নীচের দিকে প্রস্তরখোদিত এক শৃগাল অর্থাৎ ‘শিবা’র প্রস্তরখোদিত মূর্তি বর্তমান। এই দেবী শিবাখ্যা খুবই জাগ্রতা। দীর্ঘদিন মহেন্দ্রের রাজধানীতে পূজিতা হবার পর তিনি অপহৃতা হয়েছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজিতেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে একসময়, এই বংশের একজন রাজা খাজনা আদায়ে বের হয়ে গ্রামের প্রান্তে এক লাবণ্যময়ী কিশোরীকে দেখতে পান। কিশোরী রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে অন্তর্হিত হন। রাত্রে রাজা স্বপ্নাদেশ পান— সেই কিশোরী বলছেন ওই বংশের রাজকন্যা শৈবলিনীর স্মৃতিবিজড়িত পুকুরে তিনি নিমজ্জিত আছেন। তিনিই দেবী শিবাখ্যা।

একবার একদল চোর দেবীর অলঙ্কারাদি চুরি করে দেবীকেও অপহরণ করে নিয়ে যেতে থাকে। তবে, যতই এগোতে থাকে, দেবীমূর্তি ততই ভারী বলে বোধ হতে থাকে। তারা বর্ধমানের প্রথম বাসস্টপের কাছে দেবীকে নামিয়ে দেয়। দেবীর শাপে তাঁরা অন্ধ হয়ে রাস্তার ‘কুলি’তেই পড়ে থাকে। তাই জায়গাটি ‘চোরকুলি’ নামে পরিচিত। সকালে দেবীকে পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। চোরেরাও শাস্তি পায়। দশভুজা মূর্তি, সঙ্গে পুত্রকন্যা নেই। কালো প্রস্তরের দু’ফুটের সমান উঁচু। গঠনশৈলী মনোমুগ্ধকর।

প্রতি বছর দেবীর অঙ্গরাগ হয়। দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। সিংহ হলুদ ও অসুর সবুজ। এ পূজার বোধন হয় মহালয়ার এক সপ্তাহ আগে। চালকুমড়ো বলি দিয়েই সেদিন পুজো হয়। গ্রামের উত্তরপাড়ার পুকুর থেকেই ঘট আনা হয়।

গ্রাম্য কবি দেবেন্দ্রনাথ, চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর ‘শিবাখ্যা কিঙ্কর’ কাব্যতে লিখেছেন—

‘হেরিল মেঘের গায় রজত পর্বত আছে
শোভিতেছে সুবিশাল শিবাখ্যা মন্দির।’

তিনিই গ্রামের শাসনদেবী। বছরে চারবার তাঁকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা হয়। দিনগুলি হন, শারদীয়া নবমী, নবান্ন কালীপূজা, পৌষ সংক্রান্তি। ■



কাম্বোডিয়ায় হিন্দু দেব-দেবী

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

কাম্বোডিয়া দেশটির কথা মনে পড়লেই, চোখে ভেসে ওঠে আঙ্কোরভাট মন্দিরের দৃশ্যমান তিনটি চূড়া। জনসংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ছ'ভাগের একভাগ, আর আয়তনে প্রায় দু'গুণ বড়ো দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার এই দেশটির বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ শতাংশ বৌদ্ধ হলেও, একদা হিন্দু সংস্কৃতির উৎসে প্রোথিত ছিল কম্বোজ সভ্যতার শিকড়। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ খেমের রাজ দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের সময়ে নির্মিত হয়েছিল আঙ্কোরভাট (সঠিক উচ্চারণে 'ভাট' নয়, 'ওয়াট')। হিন্দু ধর্মানুসারী রাজা সূর্যবর্মণ এই মন্দির উৎসর্গ করেছিলেন ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে। বস্তুত সমগ্র আঙ্কোরওয়াট মন্দির নির্মাণ শৈলীর পশ্চাতে হিন্দুধর্ম ও পুরাণের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'মন্দির-পর্বত' ঘরানার এই মন্দির তৈরি হয়েছিল মেরুপর্বতের অনুকরণে। সমস্ত মন্দিরটি ত্রি-স্তরীয় পিরামিডের মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে। শীর্ষ অংশে পদ্মের পাঁচটি পাপড়ির মতো সংস্থাপিত রয়েছে পাঁচটি চূড়া। আর এই মন্দিরের চারদিকে প্রাকার-কক্ষের মতো ঘিরে থাকা অংশের দেওয়ালে রয়েছে অনবদ্য রিলিফের কাজে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য। কোথাও রয়েছে রামায়ণের কাহিনির রিলিফ ভাস্কর্য।

বস্তুত কাম্বোডিয়ার এই ভারতীয়করণের মধ্য দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি বিস্তারের সূচনা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই। মূলত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই এই যোগাযোগের সূত্রপাত। ফুনান ও চেন্দলায় 'প্রাক আঙ্কোর' যুগের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ও অববাহিকায় শিব ও বিষ্ণু বিশেষ ভাবে পূজা পেতেন। কম্বোডিয়ার ইতিহাসে 'আঙ্কোর পর্ব' যখন শুরু হয়, হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জয়বর্মণ (দ্বিতীয়) ৮০২ খ্রিস্টাব্দে রোলুঅস-এ রাজধানী স্থাপন করেন এবং এই স্থানের নাম দেন হরিহরালয়। বস্তুত 'হরিহর' এই কাল্টটি কম্বোডিয়ার এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। শুধু তাই নয়, শিব পার্বতীর যুগ্ম মূর্তি যা আমাদের দেশে অর্ধ নারীশ্বর হিসেবে পূজা পেয়ে এসেছে, কাম্বোডিয়ায় তার নিদর্শন এই সময়ে আমরা পাচ্ছি।

সিয়েম রিয়েপ শহর যেখানে আঙ্কোরওয়াটের নিদর্শন রয়েছে, তার থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ফুনম কুলেন বা কুলেন পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে এসেছে সিয়েম রিয়েপ নদী। আর এই নদীর জলের তলায় রয়েছে এক অত্যাশ্চর্য প্রত্নসম্ভার! এক হাজার শিবলিঙ্গ খোদাই করা রয়েছে এই নদীর পাথুরে চাতালে। যে কারণে এই নদীর নাম হয়েছে 'হাজার লিঙ্গের নদী'। শুধু লিঙ্গ নয়, পাথরে গৌরীপটও খোদিত রয়েছে। সাধারণ জনসাধারণ বিশ্বাস করতেন, এই উর্বরা শক্তি বিধৌত জল নিম্নে প্রবাহিত হয়ে শস্যশ্যামলা করে তুলবে কৃষিক্ষেত্রগুলিকে। হাজারো লিঙ্গের এই অঞ্চলটির নাম কেবল স্পিয়েন। নদীতল ছাড়াও, এর দুই পাশে বেলে পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছিল বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্ধশায়িত বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, হরপার্বতী, ব্রহ্মা, রাম ও হনুমান। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার পাশাপাশি হনুমানের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বহির্ভারতের যে যথেষ্ট ছিল প্রাচীন কাল থেকেই, তার পরিচয় বহন করে কাম্বোডিয়ার এই স্থাপত্য-ভাস্কর্যগুলি। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে এই ভাস্কর্যগুলি মূলত ১ম সূর্যবর্মণ থেকে ২য় উদয়াদিত্য বর্মণের রাজত্বকালের মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল।

দ্বাদশ শতকে সপ্তম জয়বর্মণ মহাযান বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সময় কিছু হিন্দুদেবতার বৌদ্ধ মূর্তিতে রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়। যার কিছু চিহ্ন এখনও রয়েছে। আঙ্কোরের মন্দিরে বিষ্ণু মূর্তি হরিদ্রাভ পোশাকে আবৃত হয়ে বুদ্ধদেব রূপে পূজা পাচ্ছেন। আবার এর কিছু সময় পরে অল্প দিনের জন্য হিন্দু প্রভাব বৃদ্ধি পেলে, তারা বুদ্ধদেবের কিছু কিছু মূর্তিকে বিকৃত করে শিবলিঙ্গের ভাস্কর্য দ্বারা আবৃত করার চেষ্টা করে। এভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ দুইয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে বর্তমান বৌদ্ধধর্ম প্রধান রাষ্ট্রটি রয়েছে তার গভীরে জিইয়ে থাকা হিন্দু ধর্মের চিহ্ন এখন অনপনেয় থেকে গিয়েছে। যেমন গণেশ ঠাকুর।

গণেশ ঠাকুর এখন কম্বোডিয়ায় কাণীশ নামে পরিচিত। সিদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা হিসেবে কাম্বোডিয়াবাসীর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা লাভ করে থাকেন তিনি। শুণ্ডধারী বৃহৎ বপু গণেশের প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি কম্বোডিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেক দেবতা ব্রহ্মার নাম স্মরণ করতে হয়। ত্রিমূর্তির অন্যতম স্রষ্টাপুরুষ ব্রহ্মার মূর্তি এবং মন্দির সচরাচর আমাদের দেশেও দেখা যায় না। এখানে যে ফ্রোম-এর মন্দির --- তা আসলে ব্রহ্মার দেবালয়। প্রকাণ্ড চত্বর ঘেরা এই মন্দির ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সহায়তায় সংরক্ষিত করা হয়েছে। বেওন-এর চতুর্মুখ শীর্ষ যুক্ত কাম্বোডিয় স্থাপত্যের অনবদ্য নিদর্শন যে প্রকাশ মন্দির তা বৌদ্ধযুগের হলেও চতুর্মুখ ব্রহ্মার ভাবনাটির ছায়াপাত লক্ষণীয়। যদিও কেউ কেউ বলেন এটি বিষ্ণুর মুখ বা হরিহর। ■



হারিয়ে যাচ্ছে পরম্পরাগত দেওয়ালচিত্র

চূড়ামণি হাটি

খড়ের ছাউনি আর মাটির দেওয়াল; এমন বাসস্থানও যে কতটা আকর্ষণীয় করে তোলা যায়; তারই চেষ্টা চালাতো বাড়ির মেয়েরা। নানা সৌখিন সাজে সেজে ওঠে মাটির ঘর। ফ্রেমবন্দিও হয়েছে বাড়ির মেয়েদের অনেক কাজ। তুলোর হাঁস, ধানের মালা, উলের টিয়াপাখি, কচের গুলি সুঁতো গাঁথা লেখাও ফ্রেমবন্দি হয়েছে। তৈরি হয়েছে কতসব বিচিত্র নক্‌শিকাঁথা ও জালগেঞ্জি বিনুনি বাঁধার কৌশলে তৈরি হয়েছে নানা ধরনের শিকে। টেপা পুতুল তো রয়েইছে। উঠোন জুড়ে আলপনা। দেওয়াল জুড়ে কত ছবি। নিজেও সেজেছে। ঘরও সাজিয়েছে। খড়ের বোরের মড়াই কিংবা চেরা বাঁশের ডোলও সেজেছে মেয়েদের হাতের স্পর্শে। গুরুত্ব পেয়েছে লোকাচার কেন্দ্রিক ভাবনা।

গ্রামের অনেক ঘর পাঁচিল দিয়ে আড়াল থাকে এবং সম্মুখে থাকে একটি দরজা। পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূমে মূলত দেওয়াল চিত্রের চল। পাঁচিল ও ঘর দুই চিত্রিত হতো। বর্তমানে সাঁওতাল পল্লীতেই দেওয়াল চিত্রের চল বেশি। এ সমাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অঙ্গ হিসাবে যেমন দেওয়াল চিত্রের গুরুত্ব আছে, তেমনি অপ শক্তি প্রবেশ করতে পারে না এমন বিশ্বাসও আছে। দেওয়াল চিত্রে আগ্রহ দেখিয়েছে তথাকথিত নিম্নবর্গের পরিবারগুলির পাশাপাশি ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়রাও। সৌন্দর্য ও শ্রী উভয়ই গুরুত্ব পেয়েছে। দেওয়াল চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে উপাদান সংগ্রহ সবই মেয়েদের উদ্যোগেই হয়ে থাকে। কথায় আছে মেয়ে ছাড়া ঘর শ্রীহীন। কাজে লাগিয়েছে মনের খুঁশিতে যে কোনো মাধ্যম।

দেওয়াল চিত্রের রং ও রূপ দুই প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত। লীলায়িত রঙিন রেখায় শুধু মিশে যায় শিল্পীর মন। সাঁওতালরা বাঁধনা পরবের আগে আর অন্যেরা মূলত লক্ষ্মী পুজোকে মাথায় রেখে দুর্গা-কালি পুজোর আগে মূল দরজাকে ঘিরে দেওয়ালে নানা চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। অলঙ্করণের বিষয় প্যাটারি ফুলের ছাপ, আধ ফোটা পদ্ম থেকে প্রস্ফুটিত পদ্ম-সহ



নানা সংকেতিক ফুল, পাতা, গাছ, পাখি, মোরগ ঝুটি, মকরের মুখ, মাছ, ঢেউখেলানো জল, সূর্য- চন্দ্র, জ্যামিতিক নক্‌শা ভূতপ্রেত ও দেব-দেবীর ছবি। মড়াইতে গুরুত্ব পেয়েছে রাতের শিকারি পেঁচা। লক্ষ্মীকে আগলে থাকে তাঁর পেঁচা বাহনটি।

খাদান থেকে সংগ্রহ করে আনা এক ধরনের বেলেমাটি; যা দুধেমাটি হিসেবে আঞ্চলে পরিচিতি। দেখতে কালো হলেও রোদে শুকালে সাদা হয়। এ মাটি দিয়েই প্রথমে ঘর নিকোনো হয়। গোবর তো রয়েইছে। খড়িমাটিও সাদা। সাদা রঙের জন্য ব্যবহৃত হয় মূলত কলিচুন। গিরিমাটি লালচে গেরুয়া। নীল চাষ হয়। নীলের সঙ্গে গেরুয়া মেশালেও সবুজ রং মেলে। শিম পাতা তো আছেই। পাকা পুঁই মেচুরির রস থেকে কিংবা মাটির সঙ্গে সিঁদুর মিশিয়ে বেগুনি রং। হলুদও চাষ হয়। হলদে বনক। খড়-কুটো পুড়িয়ে কিংবা চাল পুড়িয়ে বা লণ্ঠনের ভূষো থেকে কালো রং সংগৃহীত হয়। আঠা গাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে যায়। মাটি মূলত দু-তিন দিন জলে ভিজিয়ে রেখে কাজে লাগানো হয়।

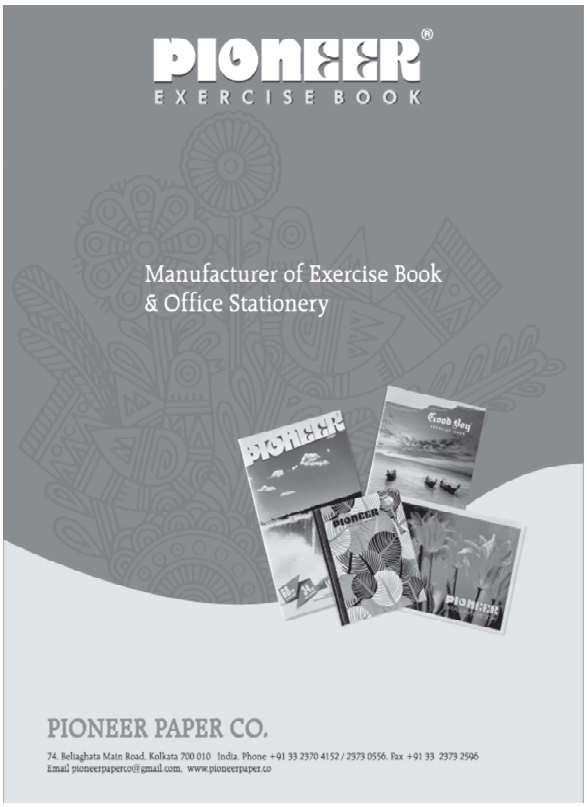
ন্যাকড়া জড়িয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনীয় চাপে আর প্রয়োজনে তুলির সাহায্য নিয়ে সেজে ওঠে বসতবাড়ি। যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার ইচ্ছা। হৃদয় ছোঁয়ানো রেখায় মনমুগ্ধ বর্ণবিন্যাস। দরজাকে ঘিরে স্বল্প রেখার প্রয়োগও যেমন মন টানে, তেমনি বহু চিত্রের সমন্বয়ও মন টানে। মন টানার মূল শক্তি ভাবনা ও রেখার সরলতা। বলাবাহুল্য পটচিত্রের শিল্পীরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ঠিকানা বোঝাতে নিজ বাসগৃহও রঙিন করেছে। বর্তমানে মাটির ঘর তৈরির আগ্রহ কমেছে। আর মাটির গায়েই দেওয়াল চিত্র শোভা পায়। হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছুই। বর্তমানে দেওয়াল জুড়ে গুরুত্ব পাচ্ছে বাণিজ্যিক সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলির রঙিন ছবি ও ভাষা। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

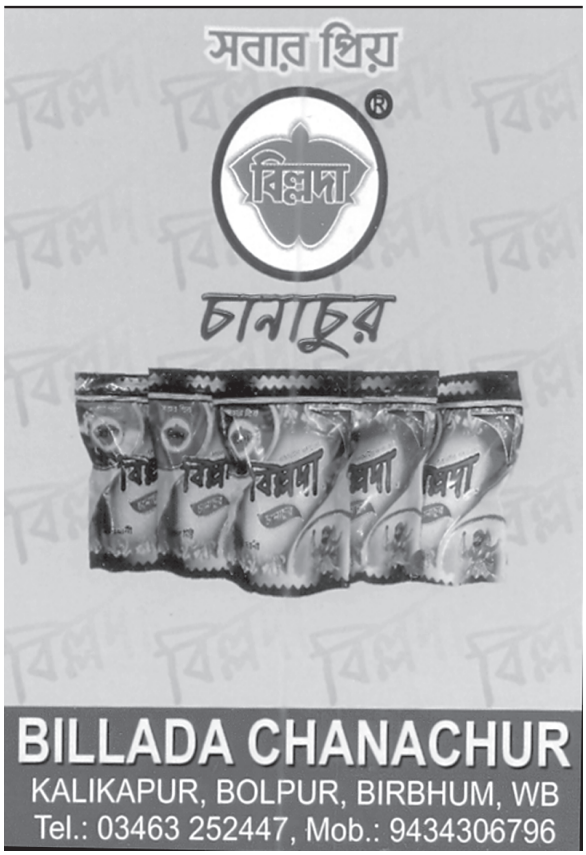
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫





পার্থিব-অপার্থিব

বরুণ দত্ত

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

চারিদিকে বিহঙ্গকুলের নীড়ে ফেরার আনন্দ কূজন।

এদিকে এপথে এসময় লোকজন তেমন একটা থাকে না।

প্রাক্ সন্ধ্যার একটা আলাদা মাধুর্য আছে, যা অনুভবে পাওয়া যায়। কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই হোটেলের দিকে ফিরছিলেন কলকাতার বিখ্যাত এক প্রাঃ লিঃ কোম্পানির রিটায়ার্ড অফিসার সুমন্ত্র মুখার্জি। এমন অপরিচিত পরিবেশে কে যেন হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে ডেকে উঠল, 'মুখার্জি সাহেব— নমস্কার— আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' বেশ আন্তরিকতা আর সম্ভ্রমের সুর প্রশ্নকর্তার গলায়।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সাগ্রহে সুমন্ত্র সন্ধান করতে থাকলেন প্রশ্ন কর্তাকে। কে তাঁকে এখানে এমন করে ডাকতে পারে? সুমন্ত এবার দেখলেন, ডানদিকের এক আশ্রম প্রাঙ্গণের সুন্দর করে ছাঁটা মেহেন্দি বেড়ার পাশ থেকে সেই ব্যক্তি আরও কিছুটা এগিয়ে এসে তেমন ভাবেই বললেন, 'স্যর, এই যে আমি। এই আশ্রমেই আমি থাকি— বিজন দাশ। চিনতে পারছেন স্যর?'

আহ্বান কর্তাকে চিনতে পেরে কেমন একটা শিহরণ নাড়া দিল সুমন্ত্রকে।

অফিসের রিটায়ার্ড ক্লার্ক বিজন দাশ, দাশবাবু। কর্মদক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মী ছিলেন ওয়ার হাউসের। কিন্তু তিনি এখানে? তিনি তো...। সুমন্ত্রর সামান্য এই চিন্তাটুকুর মধ্যেই, যেন চক্ষের নিমেষে হাসি মুখে দাশবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। হাসি মুখে, আন্তরিক ব্যবহারে, সেই সাদাসিধে, ফর্সা সুন্দর চেহারার মানুষটি এতদিন পরেও তেমনটিই আছেন। কীভাবে সম্ভব? কোথাও কি কোনও ভুল হচ্ছে! সুমন্ত্রর থেকে বয়সে অনেক সিনিয়র ছিলেন দাশবাবু, তাহলে?

কতদিন আগের কথা। কাহিনিও দীর্ঘ তবু এতদিন পরে, এমন আশ্রমিক পরিবেশে দাশবাবুর অমন আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না সুমন্ত্র। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলল আমন্ত্রণ কর্তার পিছু পিছু।

বেশ বড়ো আশ্রম এলাকা। প্রচুর ফলগাছ, ফুলের বাগান, সবজি ক্ষেত। এসবের মাছে ছোটো মন্দিরটিও সুন্দর। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় একেবারে যেন তপোবন। একদিকে আশ্রমিক ও সাধু মহারাজদের বাসস্থানগুলিও পরিবেশের সঙ্গে ভারী মানানসই।

সুমন্ত্রকে আপ্যায়ন করে একটি ছিমছাম ছোটো ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন দাশবাবু। অল্প পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বললেও, ধূপের গন্ধে ভরে আছে ঘরটি। রুচি সম্পন্ন একক খাট বিছানাসহ একটি করে চেয়ার টেবিলও রয়েছে ঘরে।

সুমন্ত্রকে চেয়ারে বসিয়ে অনুনয়ের গলায় বিজন দাশ বললেন, 'একটু বসুন স্যার। আপনার জন্য একটু বৈকালিক প্রসাদ নিয়ে এখুনি আসছি', সুমন্ত্রকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত চলে গেলেন দাশবাবু।

বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে বসে রইলেন সুমন্ত্র। ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তিও হতে থাকল তাঁর। তিনি যে শুনেছিলেন...সে চিন্তা তাড়াতে পারছেন না মন থেকে।

সুমন্ত্রদের কোম্পানির ওয়ার হাউসের ক্লার্কদের ক্যাটাগরিতে দশ-বারো ক্লাস পাশ

হলেই চলত। কিন্তু বিজন দাশ ছিলেন কমার্স গ্র্যাজুয়েট। হাতের লেখাটিও ছিল সুন্দর। ভালো মাইনে, বোনাসসহ নানা সুযোগ সুবিধে ছিল এই চাকরিতে। তেমনি অসৎপথে আয়েরও সুযোগ ছিল ক্লার্ক, ড্রাইভারসহ চতুর্থ শ্রেণীর ওয়ার হাউস স্টাফদের। দাশবাবু ছিলেন ব্যতিক্রম। কাজ করতেন মন দিয়ে, নিখুঁতভাবে। তাই দাশবাবুর একটা আলাদা স্বীকৃতি ও সম্মান ছিল সুমন্ত্র মুখার্জিদের মতো অভিজ্ঞ অফিসারদের কাছে।

ক্লার্ক অর্থে 'বাবু' সম্বোধন চলে আসছে বোধহয় জোব চার্নকের আমল থেকে। বিজন দাশবাবু ছিলেন লটিং ক্লার্ক। ক্যাটাগরি অনুযায়ী লাঞ্চ বা টিফিন সরবরাহ করত কোম্পানি। এজন্য বরাদ্দ ছিল পুরো এক ঘণ্টা। অন্যেরা টিফিন পিরিয়ডে যখন অতিরিক্ত সময়টা কাটাতো তাস খেলে, বিড়ি, সিগারেট-খইনি খেয়ে, এর ওর পেছনে লেগে হৈ হল্লা করে, দাশবাবু তখন টিফিন সেরে নিয়ে নিজের সিটে বসে সঙ্গে আনা দৈনিক কাগজ আর পত্রপত্রিকা পড়ে সময় কাটাতেন। ধূমপান যেমন করতেন না, তেমনি কোনো আড্ডা বা হল্লায়ও যোগ দিতেন না। সেহেতু তাকে 'ধম্মোপুত্তুর' বলে বিদ্রূপও করত কেউ কেউ। আর ভাবত এই 'ধম্মপুত্তুর' অফিসারদের 'চর'। তাই তাকে এড়িয়েও চলত তারা। এদের কারুর সঙ্গে অকারণ বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে, তাদের মুখের উপরেই বলে দিতেন, 'আমি তোমাদের ঘৃণা করি।' অতএব দু' এক জন ছাড়া সকলেই প্রায় শত্রু ছিল বিজনবাবুর।

গুণধরেরা কেউ কেউ ধরা পড়েছে এবং ওয়ার্নিং থেকে সাসপেন্ড, তারপর স্যাকও হয়েছে। এসবের পেছনে তারা অকারণ তাদের ধম্মোপুত্তুরের ছায়াই দেখত।

হেড অফিস থেকে ওয়ার হাউস সর্বত্র পাঁচদিনের সপ্তাহ বা ওয়ার্কিং ডে চালু হলো। ফলে সময় মতো নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে ক্লার্ক, বাইন্ডার, কুপার, ড্রাইভার সকলেরই দৈনিক দু'ঘণ্টা এবং সপ্তাহে অনধিক দশঘণ্টা ওভার টাইম চালু হলো। কারণ কোম্পানি হিসেব করে দেখেছে যে, একটি ওয়ার্কিং ডে কমিয়ে এবং এত ওভার টাইম দিয়েও লাভই হচ্ছে সবদিক মিলিয়ে।

ওভারটাইম অ্যালটমেন্টের দায়িত্ব ছিল হেড ক্লার্ক বা বড়োবাবুর হাতে। তার পছন্দ অপছন্দে অনেকের ওভার-টাইমে গরমিল হতো। পছন্দের লোকেদের কাছ থেকে বড়োবাবু ভাগ পেতেন। বিজন দাশ তো অন্য ধাতুতে গড়া, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মাঝে মাঝেই বিজনবাবুর নাম থাকত না ওভার টাইম লিস্টে।

বিজনবাবু একদিন এই ব্যাপারে তুলকালাম করে ছাড়লেন। মুখার্জি সাহেবের বুড়ি ছুঁয়ে ডিরেক্টর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁর নালিশ নিয়ে। খুব নাড়াচাড়া পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটায়। এই বড়োবাবুও কোম্পানির সুনজরে ছিলেন না। তবু অনেক কষ্টে এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং দাশবাবুকে তার প্রাপ্যের উপরেও দুএক ঘণ্টা বাড়তি ওভার টাইম দিয়ে ব্যাপারটা সহজ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বড়োবাবু। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ও ঠোঁটকাটা বিজন দাশ বড়োবাবুর সেই ঘুস বা অনুকম্পা নিতেও সম্মত নন। সবার সামনে বলে উঠলেন, 'এ সপ্তাহে আমার কোটা শেষ হয়ে গেছে, তাই এ সপ্তাহে আমি আর ওভার টাইম করব না।'

বড়োবাবুর উদ্দেশ্য সফল তো হলই না, উপরন্তু অপদস্থও হলেন বেশ। চাপা গুঞ্জন চলতে থাকল। তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই বিজনবাবুর। সেদিনও অফিসের সময় উত্তীর্ণ হলে অন্যদিনের মতো নিজের ঝোলা ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিয়ে, 'বড়োবাবু চললাম' বলে বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে।

জুনিয়র অফিসার হিসেবে এ সময় ওয়ার হাউসের দায়িত্বে ছিলেন সুমন্ত্র মুখার্জি। এক সময় তিনি হেড অফিসে পাকাপাকি ভাবে বসে গেলে, তাঁর জায়গায় এলেন অন্য জুনিয়র অফিসার। তা সত্ত্বেও ওয়্যার হাউসে কোনো অসুবিধে দেখা দিলে ম্যানেজমেন্ট থেকে সুমন্ত্র মুখার্জিকেই পাঠানো হতো সমাধানের জন্য।

এরকম একবার কোনো ব্যাপারে ওয়্যার হাউস অফিসে যেতে হয়েছিল সুমন্ত্রকে। প্রয়োজনীয় সব কাজ সারার পরে শুনলেন যে, বিজন দাশ কদিন অফিসে আসছেন না এবং এজন্য নিয়মমতো কোনো খবরও দেননি।

এটা তো শাস্তিমূলক ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় 'অফিস রুল'-এ। এটা তো বিজন দাশের না জানার কথা নয়? চাকরিও তো তার কমদিন হয়নি? তা হলে?

বিজন দাশের শত্রুপক্ষ তো এ ঘটনায় খুবই উল্লসিত। আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে 'ধম্মপুত্তুরের চাকরিটি এবার গেল।'।

খোঁজ নিয়ে যা জানা গেল, তা খুবই দুঃসংবাদ। বিজনবাবুর স্ত্রী হঠাৎ সিভিয়র স্ট্রোকে মারা গেছেন গত রবিবার। চিকিৎসার সামান্য সুযোগটুকুও পাওয়া যায়নি। মারা গেছেন হসপিটালেই। বিনা মেঘে বজ্রপাতের আঘাতে বিজন দাশ শোকে ও শূন্যতায় এমন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে, অফিসের প্রোটোকলের কথা তার মনেই পড়েনি। তাঁর একমাত্র সন্তান কিশোরী কন্যা মানসী ক্লাস সিক্সের ছাত্রী মাত্র। এক আত্মীয়ের কোয়ার্টারে থাকেন। সেখানে আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। মানসীকে সামলাতেই বিজনবাবুর পাগল পাগল অবস্থা। অসুস্থ হয়েও পড়েছে সদ্য মা-হারা মেয়েটা।

তৃতীয় দিনে বিজনবাবুর কোনও প্রতিবেশী ফোনে তাঁর হেড অফিসে এই দুঃসংবাদ জানিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই রক্ষা। বিজনবাবুর ব্যাপারে সংবাদ নেওয়ার জন্য অফিসের তরফে দায়িত্ব বর্তে ছিল সুমন্ত্র মুখার্জির উপরে।

বিজন দাশ কোনও ভাবেই ভাবতে পারেননি যে, মুখার্জি সাহেব খোঁজ নিতে আসতে পারেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর সান্ত্বনা বাক্যে এতদিনে বিজনবাবুর রুদ্ধ অশ্রুসাগর ভাসালো তাঁর বুক। তাঁর কন্যার কান্না ও সামগ্রিক পরিস্থিতিতে মুখার্জি সাহেবও বেদনাতুর হয়ে পড়েছিলেন। অনেক কথাই বললেন তিনি, তবু যেন সান্ত্বনার সঠিক ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

সুমন্ত্রর এমন স্মৃতি রোমন্থনের মাঝে হঠাৎ যেন হাওয়ায় ভেসে হাসিমুখে বিজনবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তার এক হাতে একখানা বড়ো রেকাবিতে পুজোর

ফল— সন্দেশ ইত্যাদি, অন্য হাতে জলের গেলাস। সেসব মুখার্জি সাহেবের সামনে টেবিলের উপরে রেখে বিজনবাবু অত্যন্ত অনুনয় ভরা গলায় বললেন, 'একটু প্রসাদ খান স্যার।' তারপর আবার বললেন, 'প্রসাদটুকু খান স্যার আমি মন্দিরের দিক থেকে একটু ঘুরে আসছি' এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেলেন দ্রুত, যেমন ভাবে এসেছিলেন তেমন ভাবেই।

ধাঁধায় পড়ে গেলেন সুমন্ত্র। ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। উঠতেও পারছিলেন না, যেন কেউ তাঁকে বেঁধে রেখেছে চেয়ারের সঙ্গে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ কারুর পায়ের শব্দে সুমন্ত ভাবলেন, যাক, বিজনবাবু এসে পড়লেন। সে ঘোর কাটিয়ে দেখলেন, না বিজনবাবু নয়, এলেন একজন শুভ্র বসনাবৃত ব্রহ্মচারী। চমকে উঠলেন সুমন্ত্র— ইনি কে? উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে।

ব্রহ্মচারী সহজভাবে বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনি নিশ্চয় বিজনবাবুর অত্যন্ত প্রিয়জন কেউ?'

কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে সুমন্ত্রর। কোনো রকমে নিজের পরিচয় দিলেন, জানালেন তাঁর সঙ্গে বিজনবাবুর চাকরি জনিত সম্পর্কের কথাও। তাতে যেন কিছুটা চাপ মুক্ত হলেন। অন্যদিকে তাঁর কথা শুনে ব্রহ্মচারীও যেন বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, 'আপনার কথা বিজনবাবু খুব বলতেন, আপনি কীভাবে তার চাকরি রক্ষা করেছেন। বলতেন আপনার কাছে তাঁর বিরাট ঋণ জমে আছে। এমন আরও অনেক কথাই বলতেন।'

মন্ত্র মুগ্ধের মতো ব্রহ্মচারীর কথা শুনে যাচ্ছিলেন সুমন্ত্র।... বিজনবাবু তাঁর রিটায়ারমেন্টের পরে স্ত্রীর নামে অর্থ দান করেছিলেন আশ্রমে। যাদবপুরে স্টেশনের কাছে ছোটো একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন। ...ততদিনে তাঁর মেয়ে মানসীও পূর্ণ যুবতী। রূপসী তো সে ছিলই, তখন যেন ষোল কলার চাঁদ। তেমনই উন্নতিও করেছিল পঠন পাঠনে। ল পাশ করেছিল খুব ভালো ভাবে। গোল বাঁধল এখানেই।

'...অনেকদিন বিজনবাবুর সংবাদ না পেয়ে, কলকাতায় আমাদের আশ্রমের নির্ভরযোগ্য একজন ভক্তকে অনুরোধ করা হয়েছিল বিজনবাবুর কুশল সংবাদ নেওয়ার জন্য।... 'সেই সংবাদ এরকম...

...দিন দিন পাল্টে যাচ্ছিল বিজনবাবুর বাবা-অন্ত প্রাণ কন্যা মানসী। ...সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে সে তার এক সহপাঠীকে বিয়ে করবে বলে। ছেলেটিকে বিজনবাবু একবার নয়, দেখেছেন বহুবার। ...মানসী যেমন অপরূপা ছেলেটি সম্পূর্ণ বিপরীত...জাত ধর্ম বাদ দিলেও, এই কী কোনো যোটক। বিজনবাবু এটা মেনে নিতে পারছিলেন না কোনোভাবেই। ...মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন অনেক ভাবে। ফল শুধু শূন্যই নয়, হলো আরও বিপরীত। ...এমনিতেই দিন দিন কেমন জেদি আর অমানবিক হয়ে উঠেছিল মানসী। এবার বাবাকে বলল, 'রেজিস্ট্রির দিন তোমাকেই হতে হবে প্রথম সাক্ষী।'

অসময়ে স্ত্রী বিয়োগে একবার তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল, এবার সর্বস্বান্ত হতে চলেছেন বিজন দাশ শেষবারের মতো।...চিন্তায় চিন্তায় অর্ধমৃত হয়ে তো পড়েছিলেনই, এবার অন্নজল ত্যাগ করলেন।

...সেদিন বিজনবাবু মেয়েকে হাত ধরে কাছে বসিয়ে কিছু বলতে যান আর মেয়ে বাবার হাত ছাড়িয়ে ছিট্‌কে উঠে বাবাকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল, 'আবার সেই এক কথা?'

বিজনবাবু এমন দুর্বল শরীর সামলাতে পারেনি মেয়ের সে ধাক্কা, ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে সেদিকে ফিরে না তাকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল যেন শত্রুর আক্রোশে।...

...এর পরের ঘটনা শোনার জন্য আপনি কী প্রস্তুত? ব্যথিত গলায় প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মচারী।

নিরুত্তর সুমন্ত্র। তবু চমকে উঠলেন। যা শুনলেন তিনিও তো এমনই কিছু শুনেছিলেন?

...পরদিন ভোররাতে যাদবপুরে তাঁর বাড়ির কাছের স্টেশনে গিয়ে ক্যানিং শিয়ালদা লোকাল ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিজনবাবু।

সুমন্ত্রর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল কাহিনির পারম্পর্যে। এও কি সম্ভব?

ব্রহ্মচারী কত কথা বলছেন, সব কি শুনছেন সুমন্ত্র। ...বৈকালিক প্রসাদের একখানি রেকাবির স্থান শূন্য দেখে কেমন মনে হলো, আর এদিকে বিজনবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ছুটে এলাম। দেখলাম, আমার ধারণাই ঠিক।

এমন ঘটে শুনেছি...এই ঘরেই থাকতেন বিজনবাবু...উৎসবের সময় ঘরের অকুলান হলে খোলা হতো এই ঘরটি, না হলে বন্ধই থাকে। ...বিজনবাবু যে কদিন আশ্রমে থাকতেন, কতো কাজ করতেন। ফুল বাগানের পরিচর্যা ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। ...আশ্রমে আসার সময় পণ্ডিচেরী আশ্রমের ধূপ আর কলকাতার নামি দোকানের কড়া পাকের সন্দেশ নিয়ে আসতেন। ...এখনও আশ্রমের কেউ কেউ দেখেন যে, বিজনবাবু ফুলবাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত বা মন্দিরে বসে আরতি দেখছেন, হয়তো বা তন্ময় হয়ে বসে ভজন শুনছেন... এর বেশি কিছু নয়। ...আপনি স্বাভাবিক হোন মুখার্জি সাহেব, ওঁর মতো সাত্ত্বিক চরিত্রের মানুষের দ্বারা কখনও কারুর ক্ষতি হতে পারে না...এমন গৃহী সৎ সজ্জন মানুষ সংসারে কমই দেখা যায়...বেশিক্ষণ থাকেন না,...না না, ভয়ের কিছু নেই...।' সুমন্ত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন ব্রহ্মচারী '...চলুন আপনাকে আপনার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি। সুযোগ থাকলে কাল দিনের বেলা আসুন একবার। আশ্রম ঘুরিয়ে দেখাব, আনন্দ পাবেন।'

বিজনবাবুও তো এমনই অনুরোধ করেছিলেন। এত কিছু যা ঘটল তা বাস্তব, না হ্যালুসিনেশন! ভয় নয়, বিস্ময়ের মেঘে যেন হারিয়ে যাচ্ছেন সুমন্ত্র। প্রশ্ন হারায় না তবু, 'তাহলে ঘরময় এই ধূপের গন্ধ, প্রসাদের রেকাবি, জলের গেলাস, আমি-আপনি?'

মুখার্জি সাহেবের প্রশ্নে ব্রহ্মচারী শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে একটি মাত্র বাক্যে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'সব সত্যি'। ■



গোধরা কাণ্ডের নেপথ্যে ছিল ষড়যন্ত্র

সবরমতী এক্সপ্রেস। বেশিরভাগ যাত্রীই করসেবক বা রামসেবক এবং গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁরা ফিরছেন অযোধ্যা থেকে, যে অযোধ্যায় প্রায় এক দশক আগে বাবরি ধাঁচা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিয়ন্ত্রিত রামসাধক আর বজরং দলের সদস্যরা।

যাত্রীরা বেশ ক্লান্ত। দীর্ঘ ১২০০ কিলোমিটার ট্রেন-যাত্রায় তাঁরা বিধ্বস্ত। খিদেয়-পিপাসায় কাতর। ট্রেন ঢুকেছে গোধরায়। আমেদাবাদ আসতে আর বেশি দেরি নেই। বাড়ি ফেরার তাড়নায় তাঁরা অস্থির। বিশেষ করে শিশুরা যাঁরা অযোধ্যাকাণ্ডের সময় এই পৃথিবীর আলোই দেখেনি।

মাত্র মিনিট পাঁচেক। সবরমতী এক্সপ্রেসের বাঁশি বেজে উঠল। ট্রেন ছাড়ল আমেদাবাদের উদ্দেশে। পশ্চিমদিকে।

বড়ো জোর ৭০০ মিটার গড়িয়েছে ট্রেনের চাকা। আচমকাই থেমে গেল সবরমতী এক্সপ্রেস। ফালিয়া সিগন্যালের কাছে। সিগন্যাল সবুজ। থামার কথা নয়। তাহলে...? যাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রেনের কামরাগুলোয় এসে পড়তে লাগল পাথরের টুকরো, আধলা ইঁট। জানলার কাঁচ ভেঙে ইঁট-পাথর লাগছে যাত্রীদের গায়ে, মাথায়। আচমকা আক্রমণে বিভ্রান্ত যাত্রীরা। ব্যাপারটা কী?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল তাঁদের। প্রায় দু'হাজার মানুষ ঘিরে ধরেছে ট্রেনের বিভিন্ন কামরা। বিশেষ করে কামরা নম্বর এস-৬, যেখানে অযোধ্যা-ফেরত তীর্থযাত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তারা পাথর ছুঁড়ছে আর আওয়াজ উঠছে— 'মারো, কাটো, জ্বলা ভি দো।' কাছেই কোনও মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাইকের নির্দেশ— 'একটা হিন্দুকেও ছাড়বে না। মেরে কেটে টুকরো টুকরো করে জ্বালিয়ে দাও। ইসলাম বিপন্ন।'

এখানে ট্রেন থামার কথা নয়। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আপতকালীন চেন টেনে থামিয়েছে ট্রেনটিকে এবং দুষ্কৃতীদের কেউ না কেউ এ কাজ করেছে পূর্বপরিকল্পিতভাবে গোধরা থেকেই ট্রেনে উঠে।

কামরায় কামরায় আক্রান্ত যাত্রীদের পরিত্রাহী রব— বাঁচাও বাঁচাও। কিন্তু কে বাঁচাবে? ইঞ্জিনের সামনে লাইনের ওপর শত শত মানুষ। ট্রেনের গার্ডসাহেব আপতকালীন চেন রিসেট করে ট্রেন চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উন্মত্ত জনতার তাড়ায় তিনি তাঁর কামরায় উঠে দরজা বন্ধ করে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন।

যাত্রী কামরায় তখনও চলছে অনর্গল পাথর বৃষ্টি। কাঁচ ভাঙা জানালায় ব্যাগ সুটকেস দিয়ে আড়াল করেও রেহাই মেলেনি। কারণ ততক্ষণে এস-৬ কামরা জ্বলে উঠেছে পেট্রলের আগুনে। সেই আগুন থেকে রক্ষা পেতে যারা কামরার বাইরে ঝাঁপ মারছেন, তাঁদের গলায়, পেটে, বুকে পড়ছে তরোয়ালের কোপ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রেললাইন, পাশের সবুজ ঝোপ। কারও কারও কাটা মুণ্ডু নিয়ে তখন লোফালুফি করছে কিছু নৃশংস আক্রমণকারী।

কয়েক মিনিটের ব্যাপার। জলন্ত কামরায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল ৫৯টি দেহ। বাকিরা গুরুতর আহত। রক্তাক্ত, আগুনে পোড়া দেহগুলি কাতরাচ্ছে লাইনের পাশে শুয়ে। ক্ষণ গুনছে মৃত্যুর।

দমকলের গাড়ি যখন এসে পৌঁছল, ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। পরে জানা গিয়েছিল, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা কট্টর ইসলামপন্থী হাজি বিলালের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র করে খারাপ দেওয়া হয়েছিল দমকলের



পুড়ে যাওয়া কোচের ভেতরের অংশ (ফাইল চিত্র)

ইঞ্জিন। সেসব মেরামত করে তবেই বেরোতে হয়েছে। তার ওপর গোধরায় ঢোকার মুখে বাধা দেয় আরও একদল মত্ত জনতা। গোধরা স্টেশনে দমকলের গাড়িগুলি ঢুকল ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন, তোবড়ানো শরীর নিয়ে। আগুন নিভে যাবার পর তাঁরাই টেনেটুনে কামরা থেকে নামালেন ৫৯টি পোড়া দেহ। গুরুতর আহত ৪৩ জনকে পাঠানো হলো স্থানীয় হাসপাতালে। পুলিশও হতবাক। তাদের অনেকেই ঘটনার বীভৎসতা দেখে আতঙ্কিত। এমন অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে এই প্রথম। আর তাঁদের সংখ্যা তো জমায়েত হওয়া জনতার তুলনায় নগণ্যই। কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন একজন মহিলাযাত্রী। ট্রেনের নীচে আত্মগোপন করেছিলেন। পুলিশ দেখে আছড়ে পড়লেন একজন কনস্টেবলের পায়ে। তাঁর আর্জি, তিনি তাঁর গায়ের সব সোনার গয়না পুলিশকে দিয়ে দেবেন। 'স্রিফ মেরি জান বাঁচাইয়ে।'

পুলিশ বাধ্য হয়েই শূন্যে গুলি চালাল। উন্মত্ত জনতা কিছুটা পিছু হটলেও ফের দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ হানল তারা। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে পড়েছে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স। দেরি না করে গুলি চালাল তারা, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ল। পিছু হটল আক্রমণকারীরা। তারপর সব শান্ত।

গোধরায় যখন পোড়া মাংসের গা-গুলোনো আবহাওয়া, পুড়ে যাওয়া সবরমতী এক্সপ্রেস নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে, ততক্ষণে হাওয়ায় ছড়াতে শুরু করেছে হিন্দু-নিধনের নৃশংস কাহিনি।

মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদিনও রোজের মতোই ভোর পাঁচটায় উঠে পড়েছিলেন বিছানা ছেড়ে। রোজকার মতো যোগব্যায়াম, জগিং সেরে ইন্টারনেটে দেখে নিয়েছেন কিছু জরুরি খবর আছে কিনা। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন খবরের কাগজগুলো। ব্রেকফাস্টও সেরেছেন ঘড়ি ধরেই।

সকাল ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ তাঁর কাছে খবর পৌঁছল গোধরায় একটা ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। নিশ্চিত খবর নয়, কারণ উড়ো খবর আসছিল ট্রেনে আক্রমণ হয়েছে এবং কয়েকজন যাত্রী মারা গেছে। মোদী চেয়েছিলেন তখনই গোধরায় পৌঁছতে। কিন্তু সেদিন বিধানসভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পেশ করবেন রাজ্য বাজেট। উপায় ছিল না। বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ তিনি বিস্তারিত খবর পেয়েই ছুটলেন।

তখনও জানা নেই, আক্রমণকারী কারা, মৃতের সংখ্যাই বা কত। তবুও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন নিজে রওনা হওয়ার আগে। মোদী জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকলেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, গোটা রাজ্যে সতর্কতা জারির। মোদী নির্দেশ দিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সমস্ত এজেন্সি ও বিভাগের সব কর্মচারীর ছুটি বাতিল থাকবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত। আর নির্দেশ দিলেন সংরক্ষিত সমস্ত বাহিনীকে তৈরি থাকতে।

গান্ধীনগর থেকে গোধরার দূরত্ব ১২৫ কিলোমিটার। সোজাসুজিই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গুজরাট সরকারের কোনও হেলিকপ্টার ছিল না। অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি (ONGC)-র কাছে হেলিকপ্টার চেয়েও পাওয়া যায়নি। কারণ এক ইঞ্জিনের যে হেলিকপ্টারটি তাঁদের জিম্মায় ছিল, সেটিতে মুখ্যমন্ত্রীর মতো ভি ভি আইপিকে বহন করার রিস্ক তাঁরা নিতে পারেননি।

অতএব শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী বিমানে রওনা হলেন ভাদোদরার পথে। সেখান থেকে সড়কপথে গোধরায় পৌঁছে ঘটনায় বীভৎসতা দেখে মোদী স্তম্ভিত। ভাবতেও পারেননি, এমন নৃশংস হত্যালীলা মানুষের পক্ষে সম্ভব!

মোদী জানতেন— এই ঘটনার জল গড়াবে বহুদূর। গুজরাটের মতো দাঙ্গাপ্রবণ রাজ্যে পরদিন থেকে যে কী শুরু হয়ে যাবে কেউ জানে না। সাম্প্রদায়িক হত্যার খবরের প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক। অতএব তিনি আগেভাগেই গোধরায় বসেই প্রেস বিবৃতি দিলেন : ''This is human terrorist crime of collective/ mass violence is not an incident of communal violence.''

এই ঘটনা যে সাম্প্রদায়িক ঘটনার চেয়ে মারাত্মক কোনও ষড়যন্ত্রের ফল, তাতে মোদীর কোনও সন্দেহই ছিল না। এবং পরবর্তীকালে তা সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। মোদী প্রেস বিবৃতিতে আরও বললেন : ''The Government will not be lacking in discharging (its) duty...No efforts will be spared in ensuring law and older.''

গোধরায় কার্ফু জারি করা হলো। সেইসঙ্গে ২৮টি শহরেও। গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল পুলিশ বাহিনী। ধরপাকড় শুরু হলো আগাম সতর্কতা হিসেবে। ঘটনার দিনই আটক করা হলো ১৩৭ জন হিন্দু ও ৮০ জন মুসলমান দুষ্কৃতীকে। সমস্ত মন্দির এবং মসজিদে জারি হলো সতর্কতা ব্যবস্থা। বসল কড়া পুলিশ প্রহরা।

মোদী তখনও গোধরাতেই। খবর পেলেন, গোধরায় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি 'গুজরাট বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ এক সাংগঠনিক বিষয়, রাজনৈতিকও। প্রশাসন বাধা দিতে পারে না। তবে পরিষদের 'বনধ'

মানেই আমেদাবাদে হাজার হাজার রাগী হিন্দু জনতার জমায়েত হওয়া। সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

নরেন্দ্র মোদী গোধরা থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানালেন, দ্রুত চার কোম্পানি দাঙ্গা প্রতিরোধ বাহিনী, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স এবং দশ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী পাঠাতে।

মুখ্যমন্ত্রী গান্ধীনগরে পৌঁছলেন গভীর রাতে-– প্রথমে সড়কপথে ভাদোদরায়, সেখান থেকে বিমানে আমেদাবাদ। তারপর সড়কপথে গান্ধীনগর। মোদী চিন্তিত, বিমর্ষও।

পরদিন থেকে গোটা রাজ্যকেই মুড়ে ফেলা হলো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে। ছ' হাজার পুলিশ, ৫৮ কোম্পানি রাজ্যের সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী, চার কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা শুরু করে দিয়েছে রুট মার্চ সমস্ত স্পর্শকাতর অঞ্চলে। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতটা বিনিদ্রই কাটল মোদীর। গোধরা থেকে ফেরার পর রাতেই পদস্থ অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করলেন। কেন্দ্রের কাছে জরুরি ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হলো সেনাবাহিনী চেয়ে। তখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। তাঁকেও ব্যক্তিগত অনুরোধ জানালেন মোদী।

কিন্তু জানা গেল, সেনাবাহিনী পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ কিছুদিন আগেই দিল্লির সংসদ ভবনে পাক- জঙ্গিবাহিনীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবিহিনীর বড়ো অংশকেই সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'অপারেশন পরাক্রম'-এ অংশ নিতে। তবুও মুখ্যমন্ত্রী মোদী চেয়েছিলেন, সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে জুনিয়র সৈন্যরা অন্তত আসুক। তাও ব্যবস্থা হয়নি।

তবে সতর্ক নরেন্দ্র মোদী একটা কাজ করেছিলেন, ওই রাতেই গোধরা থেকে সমস্ত মৃতদেহ এনে আমেদাবাদ শহরের এক প্রান্তে সোলা হাসপাতাল থেকে পোস্টমর্টেমের পর পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। সংবাদমাধ্যমও খবর পায়নি। উদ্দেশ্য ছিল, গোধরায় যাতে দাঙ্গা না হয়। যদিও ১৩টি মৃতদেহ সনাক্ত করার মতো কেউ ছিলেন না। সেগুলি তুলে দেওয়া হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাতে। পরে হাসপাতালের পিছন দিকে সরকারি চিকিৎসক এবং স্থানীয় পুরসভার কাউন্সিলর জগদীশ প্যাটেলের উপস্থিতিতে সেগুলি গণদাহ করা হয়। গোটা কাজটাই করা হয়েছিল যাতে পরদিন থেকে হিন্দু জনরোষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত না হয়।

কিন্তু কপাল খারাপ নরেন্দ্র মোদীর। চিরকালই যিনি নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। পরদিন রটে গেল, রাতে পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মোদী নাকি নির্দেশ দিয়েছেন মুসলমানদের হত্যা করতে। পরদিন সকালে রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘটনার বিবরণ পেশ করলেন এবং কংগ্রেস-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চাইলেন যাতে রাজ্যকে দাঙ্গামুক্ত রাখা হয়।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সকাল ১০টা নাগাদ আমেদাবাদের উত্তর-পূর্বে নারোদা পাটিয়া অঞ্চলে অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত মুসলমান জনবসতির ওপর আছড়ে পড়ল হিন্দু জনরোষ। সশস্ত্র এই হামলায় বেশ কিছু মানুষ প্রাণ তো হারালেই, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ঘরবাড়ি, ব্যবসা সব কিছুই।

শোনার পর মোদীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, পুলিশে কী করছিল? একটু ভাবনা-চিন্তার পর মোদীর মনে হয়েছিল— তাঁর রাজ্য দাঙ্গার জারকরসে রসাদৃত। সেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছড়িয়েছে রাজনীতি, আমলাতন্ত্র এমনকী পুলিশ প্রশাসনেও।

নারোদা পাটিয়ার ঘটনা যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র— মোদীর বুঝতে দেরি হয়নি এবং জানাও গেল, কেশুভাইপন্থী বিজেপির এক মহিলা বিধায়ক মায়া কোদনানিই প্রথম বজরং দলের বাবু বজরঙ্গীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নারোদা পাটিয়ায় হামলা চালিয়েছে। অস্ত্র তুলে দিয়েছে উত্তেজিত হিন্দু জনগণের হাতে। তার পরিণতিতেই মরতে হয়েছে মুসলমান পুরুষ, মহিলা, শিশুদের সঙ্গে হিন্দু জনতাকেও। এই মায়া কোদনানিই আবার পরে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করেন। এর সঙ্গে মিলেমিশে গেল সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদের অভিযোগ, মোদীর নির্দেশে ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পি সি পাণ্ডের নেতৃত্বেই চলেছে গণহত্যা। এমন অভিযোগও হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো যে মোদীর নির্দেশে প্রকাশ্য দিনের আলোয় গোধরায় নিহতদের মৃতদেহ আমেদাবাদ শহরে ঘোরানো হয়েছে যাতে হিন্দু জনগণের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা সমস্ত সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT)-এর রিপোর্টে এই সমস্ত ঘটনাকেই অবাঞ্ছিত গুজব এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

নারোদা পাটিয়ার ভয়াবহ হাঙ্গামার পর গণ্ডগোল ছড়ালো উত্তর-পশ্চিমে চমনপুরাতে। চমনপুরায় ছিল উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারের একটি বড়ো আবাসন--- গুলবার্গ সোসাইটি। হিন্দু দাঙ্গাবাজরা হামলা করল ওই আবাসনে। আবাসনের বিশিষ্ট বাসিন্দা ৭৩ বছর বয়সী প্রাক্তন কংগ্রেস সংসদ সদস্য এহসান জাফরি চেষ্টা করেও নিজেকে যেমন বাঁচাতে পারেননি, তেমনি বাঁচেনি অন্যান্য পরিবারগুলিও। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল ৬৮ জন মুসলমান নারী, পুরুষ, শিশুকে। এখন সেই আবাসন জনমানবহীন। শুধুমাত্র বছরে একদিন মৃতদের স্মরণে ফুলের স্তবক নিয়ে হাজির হন পরিজনরা— সে দিনটা হলো ২৮ ফেব্রুয়ারি।

পরে জানা গিয়েছিল, গুলবার্গ সোসাইটিতে হামলার ঘটনায় মূল অংশগ্রহণকারীরা ছিল কংগ্রেসি ষড়যন্ত্রকারীরা যাদের সাহায্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন এহসান জাফরি সাহেব। শুধু তাই নয়, একথাও প্রমাণিত হয়েছিল যে গোধরা জংশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের নৃশংস ঘটনাতেও হাত ছিল স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের।

(সুজিত রায় এবং রাজ মিত্র লিখিত স্বপ্নের ফেরিওয়ালা গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

আর এক নরেন্দ্র নরেন্দ্র নাম্বার টু

অঞ্জন মহাপাত্র

তিনি নরেন্দ্র নাম্বার ওয়ান। জন্ম কলকাতায়। পুরো নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের বড়ো ছেলে। তাঁকে সমগ্র ভারত চেনে স্বামী বিবেকানন্দ নামে। আর একজন হলেন নরেন্দ্র নাম্বার টু। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। গুজরাটে জন্ম। বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয়বারের জন্য। নরেন্দ্র নম্বর ওয়ান স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র নাম্বার টু তরুণ বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে আসেন। আন্তরিক ইচ্ছা ছিল মিশনের মাধ্যমে নিজেকে মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার। সেদিন যদি তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হতেন, তাহলে আজ আমরা পেতাম মিশনের এক বলিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে। শিবজ্ঞানে জীবসেবাকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করে যিনি শ্রীশ্রী ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করেছেন নিজেকে। আমরা পেয়েছি আমাদের দেশের জন্য বলিষ্ঠ এক প্রধানমন্ত্রীকে। ষাট পেরিয়েও যুবকের মতো দৃপ্ত যাঁর পদসঞ্চার, কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও সংকল্পে দৃঢ়তা। মাঝে মাঝে বক্তৃতার সময় সেই কণ্ঠস্বর যখন খাদে নেমে আসে তখন তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র তিনি ভারতীয়দের প্রতি আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'বিশ্বাস বিশ্বাস নিজের উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস'। নরেন্দ্র মোদী তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসকে অতিযত্নে হৃদয় গুহায় সুরক্ষিত রেখেছেন। তিনি ধ্যানে অভ্যস্ত, যোগাভ্যাসে স্বচ্ছন্দ। যোগাসন করেন সাবলীল ভঙ্গিমায়। স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন মানুষ কাজ করুক দেশ ও জাতির জন্য। আর্ত, অসহায়, দুর্বল ও দরিদ্রের পাশে দাঁড়াক। কিন্তু শরীরকে দৃঢ় করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করুক, যোগাসন করুক এবং মনের একাগ্রতার জন্য ধ্যান। ধ্যান যে দেব দেবীর মূর্তিতে করতে হবে এমন কথা নেই। সানফ্রানসিসকোর প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি ক্যাম্পে তিনি তাঁর অনুগামীদের একদিন বললেন, সেদিন তিনি সিংহের হৃৎপিণ্ডে ধ্যান করবেন। ধ্যান, যোগ এবং কর্মতৎপরতায় নরেন্দ্র নাম্বার টু নাম্বার ওয়ানের ভাবশিষ্য। তাঁর যথার্থ অনুগামী।

তিন বছরের কিছু বেশি সময় পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় ধর্ম ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাষণ দান, আলোচনা ও যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের পর স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দাক্ষিণাত্য হয়ে কলকাতায় ফিরলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শেষভাগে তিনি বলেন ''ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যত কিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে। ...কিছুতেই ভয় পাইওনা, তোমরা বিস্ময়কর কার্য কবিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন।''

নরেন্দ্র মোদীর জন্ম সাধারণ পরিবারে। সোনার চামচ মুখে নিয়ে তিনি জন্মাননি। কিন্তু তরুণ বয়স থেকেই তিনি জানতেন অসাধারণ হবার শক্তি রয়েছে তাঁর মধ্যে। তখন থেকে আত্মশক্তি জাগ্রত করার প্রয়াস করেছেন সর্বক্ষণ। সমাজে মান্যগণ্য হবার অথবা কোনোকিছু প্রাপ্তির আশায় যারা রাজনীতি করে তিনি তাদের দলভুক্ত নন। তিনি মনে প্রাণে জানেন রাজনীতি তাঁর কাছে মানবসেবা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, অকুতোভয় মানুষ তিনি। চালাকির দ্বারা কোনো কাজ করেন না। নোটবন্দি থেকে সার্জিকাল স্ট্রাইক প্রতিটি সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, দোলাচল চিত্তে নয়। তিনি ভেবেছিলেন এতে দেশের মঙ্গল হবে তাই করেছেন। ভারতীয় জনগণ নোটবন্দির কষ্ট সহ্য করবে কিন্তু তারা কিছুতেই সইবে না দ্বিধাগ্রস্ত গোবেচারা দুর্বল চিত্তের কোনো ব্যক্তিকে দেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে। এবারের নির্বাচনের পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নামজাদা পণ্ডিত কিংবা সবজান্তা হতে হবে এমন কথা নয়। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও সৎ হতে হবে, ঠাণ্ডা মাথায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটের মোকাবিলায় তৎপর হতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সময় ভারতবর্ষ পরাধীন। ভারতবর্ষ যে ফেলনা নয়, তার সভ্যতা সুমহান মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর একথা তিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরলেন তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও বাগ্মিতা দিয়ে। নরেন্দ্র মোদী গত পাঁচ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরূপে। স্বাধীন ভারতের চিন্তাভাবনা ও কর্মধারাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মৈত্রী ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য। ভারতের সুনাম বৃদ্ধির জন্য। সমালোচকরা যাই বলুক না কেন মোদী যে প্রমোদ ভ্রমণে বিদেশ যাননি একথা নিশ্চিত। আসলে নরেন্দ্র মোদী যখন যে কাজে হাত লাগান, সেই কাজে সমস্ত মনপ্রাণ অর্পণ করেন। তাঁর বিদেশ সফরের বেশ কিছু সুফল মিলেছে। এ বিষয়েও নিন্দুকেরাও অবগত আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'নূতন ভারত বেরুক চাষার লাঙ্গল ধরে, দরিদ্রের কুটির ভেদ করে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।' নরেন্দ্র মোদী বিবেকানন্দের সেই নতুন ভারত। আজ যিনি প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছেন একসময় তিনি চা বিক্রি করতেন। কিছু মানুষ তাঁকে চা-ওয়ালা বলে যতই বিদ্রূপ করুক না কেন, তিনি ছিলেন এক সফল চা-ওয়ালা, একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক, কুশলী মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে তিনি এক সার্থক প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানেন, সাফল্যের রহস্য সিনসিয়ারিটি, পিউরিটি, টেনাসিটি, অনেস্টি এবং সেল্‌ফ স্যাক্রিফাইস। নরেন্দ্র নাম্বার টু-র সংকল্প ভারতকে বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। নরেন্দ্র নাম্বার ওয়ান বলেছিলেন 'ভারত আবার জাগিবে...।' ▮

SUNRISE®
PURE

সানরাইজ®

মশলা



www.strategyadvertising.co.in

লা–জবাব সানরাইজ

www.sunrise.in

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একজন কৃষিবিশেষজ্ঞও ছিলেন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী



সংগীতজ্ঞ, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে একজন কৃষি- বিশেষজ্ঞ ছিলেন এই তথ্য অল্প লোকেরই জানা আছে। বঙ্গ তথা ভারতের কৃষি বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, কৃষি আধিকারিক, কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র-গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছে তাঁর কৃষি নিয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার তথ্য তুলে ধরতেই এই প্রবন্ধ।

১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ The Crops of Bengal, প্রকাশক Messrs. Thacker, Spink & Co., পুস্তক-মূল্য ২ টাকা। বইটিতে ডি.এল. রায়ের পাশে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিচয় হিসেবে উল্লেখ আছে— D.L. Roy, M.A., M.R.A.C., M.R.A.S.E. (London) (Late Assistant to Director of Land Records and Agriculture, Bengal). বইটি কলকাতাতেই ছাপা হয়েছিল। মুদ্রক হিসেবে উল্লেখ রয়েছে আর. দত্ত। হেয়ার প্রেস, ৪৬, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট।

দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা পড়তে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের সিসিটার কলেজে। ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে গিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরে ফিরে আসেন। তিনি F.R.A.S. উপাধি লাভ করলেন। সেই সঙ্গে লন্ডনের রয়্যাল এগ্রিকালচার কলেজ ও রয়্যাল এগ্রিকালচার সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়ে লাভ করলেন M.R.A.C. এবং M.R.S.A.E. বিলাতে তাঁর সঙ্গেই সিসিটার কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ রায়, ভূপালচন্দ্র বসু, গিরীশচন্দ্র বসু। এদের মধ্যে ভূপালচন্দ্র বসু পরবর্তীকালে হয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর বি.সি. বোস এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার। নিত্যগোপাল মুখার্জিই হলেন ব্রিটিশ সরকারের কৃষিবিদ তথা পরবর্তীকালে কৃষি বিজ্ঞানের অধ্যাপক এন.জি. মুখার্জি, যিনি 'Hand Book of Indian Agriculture' গ্রন্থটি লিখেছেন।

বইটির শিরোনামে এক ঝলকে যে পরিচয় রয়েছে তা এরকম : Being a practical treatise on the agricultural methods adopted in the Lower Provinces Bengal. বইটির শুরুতে দুই পাতার একটি Preface, তারপর ২১ পাতার একটি Introduction. Preface বা ভূমিকায় ডি.এল. রায় উল্লেখ করেছেন কোন কোন সরকারি পুস্তক আর রিপোর্ট থেকে তিনি নানান উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে দেখা যায় তাঁর বিলেতের সহপাঠী যাঁরা তখন সরকারের কৃষি বিভাগের নানান উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন তাদের বই ও রিপোর্ট রয়েছে, যেমন— Mr. B.C. Basu's (Rai Bahadur) Report on the Agriculture in the district of Ranchi, Mr. B.C. Basu's Notes on Indian Agriculture, Mr. N.G. Mookerjee's Hand-book of Indian Agriculture ইত্যাদি। এছাড়া ব্যবহার করেছিলেন Dr. Voelcker's Report on the Improvement of Agriculture in India, Agricultural Statistics published by the Bengal Government, Reports on the working of the Experimental Farms at Burdwan and Dumraon, Agricultural Ledgers and Bulletins, Wilson's British Farming, Mr. A.C. Sen's Report on the Agriculture in the districts of Dacca and Burdwan, Mr. N.N. Banerjee's Report on the Agriculture in the district of Cuttacks.

ভূমিকার শুরুতে ডি. এল. রায় লিখেছেন, The object of the present treatise is to give a sufficient account of the agricultural practices prevailing in the Lower Provinces regarding the cultivation of some of the most important crops grown in these parts. সেখানে উল্লেখ করতে ভোলেননি সমগ্র আলোচনার মধ্যে বঙ্গ জুড়ে তাঁর নিজস্ব কৃষি পর্যবেক্ষণের ফলাফলও মুক্ত রয়েছে। সেই সময় তিনি ব্রিটিশ ভারতের ল্যান্ড রেকর্ড অ্যাগ্রিকালচার ডিরেক্টরের সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বইটিতে তিনি আশা প্রকাশ করে লিখেছেন, যে কৃষিবিদ্যা তিনি অধ্যয়ন করেছেন, সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে সেই অধীত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি নিজস্ব কৃষি খামার গড়ে তুলতে চান, ''I look forward to the time when I may take advantage of my agicultural education by starting a farm of my own, after I shall have retied from Govenment service, and laid by a small capital to devote to the practical study of this intensely intersting subject.'' কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে লালিত ইচ্ছা পূরণ হয়নি। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন (১৯ জুলাই, ১৮৬৩—১৭ মে, ১৯১৩)। এমনকী শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি চাকুরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিতেও বাধ্য হন।

বইয়ে যে ফসলগুলির সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে তার মধ্যে ধানের উপর আলোচনা সবচেয়ে বেশি (৩০ পাতা)। তারপর গমের বিষয়ে আলোচনা (১২ পাতা)। বার্লি বা যব (৬ পাতা)। এছাড়া জই বা ওটস্, ভুট্টা, নানান দানাশস্য বা মিলেট, ইতালীয় দানাশস্য, সাধারণ দানাশস্য বা কমন মিলেট, ছোলা, মটর, মুগ, মুসুরি, খেসারি, কলাই, অড়হর, ঘোড়ামুগ, গাইমুগ, তিসি, সরষে, গিঞ্জেল্লি, নাইজার তৈলবীজ, রেড়ি, বাদাম, কার্পাস তুলো, পাট, মেস্তা, ধইঞ্চা, আখ, আলু, তামাক, মিষ্টিআলু, খামালু, বেগুন, মূলো, পটল, করলা, উচ্ছে, মিষ্টিকুমড়ো, লাউ ঝিঙ্গে, ঢ্যাঁড়শ, শশা, ফুটি, তরমুজ, কচু, আদা, হলুদ, কলা, আনারস, অ্যারারুট, পালং নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ■

সিদো-কানহুর আত্মবলিদান

ভারতের জনজাতিদের মধ্যে সাঁওতালরা সবচেয়ে জাগ্রত, প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এদের প্রাচীন ইতিহাসও কম গৌরবপূর্ণ নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এদের পূর্বপুরুষরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রকৃতিমায়ের কোলে



সুখে শান্তিতে বসবাস করত। বিদেশি আক্রমণকারীরা এদেশে প্রবেশ করার পর তাদের সুখশান্তি বিঘ্নিত হতে শুরু করে। ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর রাজস্ব আদায়ের নতুন নতুন পন্থায় এরা জর্জরিত হতে থাকে। তার উপর নীলচাষ শুরু হবার পর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণ চরমে ওঠে। শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা ক্ষোভে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে।

পাকুড় থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে ভগনাডিহি গ্রাম। এই গ্রামের চুলু সাঁওতালের চার ছেলে– সিদো, কানহু, চাঁদ ও ভৈরব। এরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই মহান বিপ্লবের। তাঁদের নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন পূর্ণিমার রাতে দশহাজার সাঁওতাল তির-ধনুক, টাঙ্গি, তলোয়ার নিয়ে ভগনাডিহি গ্রামে একত্রিত হলো। সিদো-কানহুকে রাজা হিসেবে মেনে নিয়ে তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই সময়ে একটি ছোট্টো ঘটনা বিদ্রোহের আগুনে ঘৃতাহুতি প্রদান করল। ইংরেজদের দারোগা দুজন সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করে ভাগলপুরে চালান করছিল। খবর পেয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল দারোগার কাছ থেকে ওই দুজনকে ছিনিয়ে নেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে দারোগা গুলি চালাবার নির্দেশ দিলে বিদ্রোহী সাঁওতালরা দারোগা ও সিপাহিদের ধর থেকে মাথা আলাদা করে দেয়। এরপর সাঁওতালরা ইংরেজ শাসন উৎখাতের প্রতিজ্ঞা নেয়। ঠিক হলো যেসব দেশীয় মহাজন ইংরেজদের তাঁবেদারি করবে তাদেরও কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, কিন্তু যারা সাঁওতালদের সহযোগিতা করবে তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করা হবে না।

সাঁওতাল বাহিনী কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন নীলকুঠি, ইংরেজদের কোতোয়ালি দখল করল। ভাগলপুরের কালেক্টর সেসময় রাজমহলে থাকত। সাঁওতাল বাহিনী কালেক্টরের অফিস আক্রমণ করে। ইংরেজ সরকার সাঁওতাল বিদ্রোহের খবর পেয়ে ফগনের নেতৃত্বে পাহাড়ি পল্টন পাঠালো। তারা পিয়ালপুরে সাঁওতাল বাহিনীর মখোমুখি হলো। পাহাড়ের ওপর থেকে সাঁওতালরা ইংরেজ সেনাদের ওপর তির ছুড়তে শুরু করল। তিরবৃষ্টিতে ইংরেজ সেনার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। যুদ্ধে বহু সাঁওতাল বীরগতি লাভ করল। ১৫ দিন যুদ্ধ করে রণে ভঙ্গ দিয়ে ইংরেজরা পিছু হঠল। কিন্তু সিদো আহত হয়ে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লেন। তাসত্ত্বেও ১৫ দিন কহলগাঁও থেকে রাজমহল এবং সাঁইথিয়া থেকে রানিগঞ্জ বিশাল এলাকার দখলভার সাঁওতালদের হাতে থাকল। ক্রমে ক্রমে ছোটোনাগপুর থেকে পুরো জঙ্গলমহল এবং বীরভূম-বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা সাঁওতালদের আধিপত্য কায়েম হলো।

তারপর একদিন অতর্কিতে ভগনাডিহির জঙ্গল ১৪ হাজার ইংরেজ সেনা ঘিরে ফেলল এবং সাঁওতালদের হত্যা করা শুরু করল। কয়েকদিনের মধ্যে ১০ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করা হলো। কিন্তু তাতেও তারা আত্মসমর্পণ করেনি। একদিন রাতে হাজারিবাগের দিকে যাওয়ার পথে কানহু, চাঁদ ও ভৈরো তিনভাই ইংরেজদের হাতে বন্দি হলো।

১৮৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে সিদোকে ফাঁসি দেওয়া হলো। পরের বছর জানুয়ারি মাসে কানহুকে ভগনাডিহি গ্রামে এনে প্রকাশ্যে হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে দিনেরবেলা ফাঁসি দেওয়া হলো। চাঁদ ও ভৈরোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। এই ভাবে সিদো-কানহু দেশমাতৃকার স্বাধীনতার বেদিমূলে নিজেদের প্রাণ বলি দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণা হয়ে থাকলেন। কিন্তু বিভেদ সৃষ্টিকারী ইংরেজরা স্বাধীনতার এই সংগ্রামকে কেবল মহাজনদের বিরুদ্ধে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে প্রচার করে সাঁওতালদের প্রকৃত জাতীয় স্বরূপকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দিল। বিশেষ সংরক্ষণের নাম করে সাঁওতালদের রাষ্ট্রীয় ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করার জন্য ইংরেজরা ১৫/২০ হাজার বনবাসীকে কেবল হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বিদ্রোহ দমনের পর বিদেশি মিশনারিদের ঢোকানো হলো সাঁওতালদের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতা নির্মাণ করার জন্য। এই কাজে অনেকাংশে তারা সফল হলেও সাঁওতালদের রাষ্ট্রীয় চেতনার স্রোত ইংরেজরা শুকিয়ে দিতে পারেনি।

শক্তিপদ ঠাকুর

ভারতের পথে পথে

উদয়পুর



মনোহর হ্রদ, নীল জল, মনোরম প্রকৃতি, মর্মর প্রাসাদ, সুসজ্জিত উদ্যান ও প্রাচীন মন্দির --এই নিয়ে রাজস্থানের স্বপ্নের শহর উদয়পুর। প্রাসাদ রয়েছে পাঁচটি। দুটি লেক প্যালেস। পাঁচটি হলো সিটি প্রসাদ, জগনিবাস, জগমন্দির, লক্ষ্মীবিলাস ও মনসুন। প্রতিটি প্রাসাদ স্থাপত্য-ভাস্কর্য-নির্মাণশৈলী ও অলংকরণে স্বতন্ত্র। রাজপুতদের শৌর্য-বীর্যের গৌরবগাথা এই শহরের আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে। প্রাচীরঘেরা শহরে হাতির উপদ্রব ঠেকাতে লোহার গজাল বসানো ১১ টি দরজা রয়েছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পিছোলা লেক। রাজস্থানের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ মহারানার শীতকালীন আবাস সিটি প্যালেস। প্রাসাদে রয়েছে শিশ মহল, কৃষ্ণা ভিলা, ভীম ভিলা, ছোটো চিত্রশালি, দিলখুস মহল, মানক মহল, রঙিন কাঁচের মোতি মহল, বড়ি মহল, কাঁচ কি বুরুজ । রয়েছে ক্রিস্টাল গ্যালারি, জগদীশ মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, গুলাববাগ, প্রতাপ স্মারক মীরা কলামন্দির শিল্পীগ্রাম প্রভৃতি।

জানো কি?

- জালয়ানওয়াবাগ হত্যাকাণ্ডের কুখ্যাত জেঃ ডায়ারকে হত্যা করেন উধম সিংহ।
- পঞ্জাবকে ভারতের মশলা উদ্যান বলা হয়।
- ভারতে শিবাজী উৎসব প্রচলন করেন বাল গঙ্গাধর তিলক।
- পৃথিবীর বিরল উপজাতি টেটোরা বাস করেন আলিপুরদুয়ার জেলার টেটোপাড়ায়।
- ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা ২২ টি।

ভালো কথা

গোমূত্র

গোমূত্র যে গোবরের থেকে বেশি সার আগে আমাদের গ্রামের কেউ জানত না। আমাদের বাড়িতে মোট ১০টি গোরু আছে। শুধু গোবর সারা বছর একটি গর্তে জমা করে পচিয়ে সার করে জমিতে দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের দেউলাপারে আমার মামা থাকে। মামা সেবার আমাদের বাড়িতে এসে গোরুর পেচ্ছাব এভাবে নষ্ট হওয়া দেখে বাবাকে বলেন যে, গোমূত্র এভাবে নষ্ট করা ঠিক নয়। গোবরের থেকে বেশি সার গোমূত্রে। একটা গর্তে জমা করে জমিতে বা শাকসবজির গাছের গোড়ায় দিলে প্রচুর ফলন হবে। সেই মতো বাবা বালতিতে করে লাউ, কুমড়ো, শশা, লঙ্কা ও ফুলগাছের গোড়ায় দিতে শুরু করে। তারফলে প্রচুর আনাজপাতি আমাদের বাড়িতে হতে শুরু করে। আমাদের দেখাদেখি গ্রামের সবাই শুরু করে। সবার জমিতেই ভালো ফলন হচ্ছে। সব চাইতে অবাক কথা হলো, এরফলে কোনো গাছে পোকা লাগছে না।

নির্মল সামন্ত, একাদশ শ্রেণী, ভেদুয়াশোল, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কেষ্টদার কেনাকাটা

জয়জিৎ মণ্ডল, নবম শ্রেণী, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা।

বর্ষাকালে বৃষ্টিমাথায়
চলেছে পাড়ার কেষ্টদা,
ঘণ্টা দুয়েক পায়ে হেঁটে
পৌঁছে গেছে ঝালদা।
ঝালদার ঝিলের ধারে রবিবারের হাট,
কেষ্টদা মাছ কিনেছে দাম দিয়েছে ষাট।
চাল-ডাল-তেল-নুন
কলা-আলু-মুলো,
শাঁড়াসি আর কুড়ুল সহ ধান ঝাড়া কুলো।
সঙ্গে আছে অনেক টাকা
তাই সে বেজায় খুশি
বউকে দেবে তাই কিনেছে
নতুন বেনারসি।
আনন্দেতে হাটের শেষে
ফিরছে দাদা বাড়ি
মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ধরেছে গোরুর গাড়ি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

রম্যরচনা

ড. কালাম ও গীতা

একদিল চেন্নাইয়ের সাগর তটে ধুতি পরা ও শাল গায়ে এক ভদ্রলোক গীতা পড়ছিলেন। তখন একটি যুবক এসে বলল, এখন বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, আর আপনি গীতা আর রামায়ণে আটকে রয়েছেন?

ভদ্রলোক যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, গীতা সম্পর্কে তুমি কী জান?

যুবকটি উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি বিক্রম সারাভাই গবেষণা ইনসটিটিউটের একজন ছাত্র। আমি একজন বিজ্ঞানী। এখন গীতা নিরর্থক।

শুনে ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। তখনই সেখানে দুটি গাড়ি এল। একটি থেকে কয়েকজন কমান্ডো ও অন্যটি থেকে একজন সৈনিক নেমে এল। সৈনিকটি গাড়ির দরজা খুলে দিল, আর ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসে পড়লেন।

সব দেখে যুবকটি হতভম্ব হয়ে গেল। সে দৌড়ে গিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল– স্যার, কে আপনি?

ভদ্রলোক বললেন–আমি বিক্রম সারাভাই।

যুবকটি যেন ৪৪০ ভোল্টের শক্ খেল। সেদিনের সেই যুবকটি পরবর্তীকালের মিসাইল ম্যান তথা ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালাম। যিনি সারা জীবন গীতাকে পাথেয় করেছেন আর নিরামিষ খেয়েছেন।



উবাচ



নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"ইসরোর গতি ও স্থির সংকল্পের জন্য অভিনন্দন। চন্দ্রযান ২-এর সফল উৎক্ষেপণ ১৩০ কোটি ভারতবাসীর সংকল্পের নিদর্শন। প্রত্যেক ভারতীয় আজ গর্বিত। আমাদের বিজ্ঞানীরা ভারতবাসীকে গর্বিত করে চলেছেন। বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই।"

সাউথ ব্লকের দপ্তরে টিভিতে চন্দ্রযান উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখে বক্তব্য।



ওয়াল্টার লিন্ডনার
জার্মান রাষ্ট্রদূত

"বৈচিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ভারতকে পূর্ণতা দিয়েছে তারই অন্যতম অঙ্গ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এটি যে একটি গণআন্দোলন তা অনস্বীকার্য। তাই কারো পছন্দ হোক বা অপছন্দ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না।"



মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,
আরএসএস

"দেশের উপজাতিদের ভাষা-সহ সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় ৩০ শতাংশ সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। কেউ সংস্কৃত না জেনে পুরোপুরি ভারতকে জানতে পারবে না।"

নাগপুরে সংস্কৃত কলেজের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্যে



রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষমন্ত্রী

"শীঘ্রই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা হবে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই রুখতে পারব না। যদি আলোচনার মাধ্যমে না হয়, তাহলে কীভাবে এর সমাধান করতে হবে তা আমাদের জানা আছে।"

জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়াতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্যে

সাইবার অপরাধ ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ধরনের অপরাধের মেকাবিলা এবং দ্রুত তদন্ত করতে সতর্কতা জারি করেছে, পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে, সাইবার ফরেন্সিক ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন করা হয়েছে। সরকার সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানাতে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। সেটি হলো— www.cybercrime.gov.in। এতে শিশুদের নিয়ে অশ্লীল চিত্র, শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ, গণধর্ষণ অথবা অশ্লীল কোনো বস্তু সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যাবে। ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কর্মসূচি চালু করেছে। এর কাজ হবে দেশে সাইবার অপরাধের বিষয়ে সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে, পুলিশ এবং জনআইন ব্যবস্থা রাজ্যের বিষয়। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধ দমন, তদন্ত ও মামলা করা। সাইবার অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন মাফিক তদন্তকারী সংস্থা আইনি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এছাড়াও, সরকার সাইবার নিরাপত্তা বজায় রাখতে অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে :



জি কিষান রেড্ডি

(১) দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো রক্ষায় ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোটেকশন সেন্টার (এন সি আই আই পিসি) গঠন। (২) ডিজিটাল পরিষেবা দেয় এমন সংস্থাগুলিকে বলা হয়েছে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত দ্রুত সি ই আর টি-ইন-কে জানাতে। (৩) অশ্লীল বিষয়ের সম্প্রচারের খোঁজ এবং ওই ধরনের সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য সাইবার স্বচ্ছতা কেন্দ্র (বটনেট ক্লিনিং অ্যান্ড ম্যালওয়্যার অ্যানলিসিস সেন্টার) খোলা হয়েছে। (৪) সাইবার হুমকি এবং সি ই আর টি-ইন-এর পদক্ষেপ বিষয়ে সতর্কতা এবং পরামর্শ জারি। (৫) মুখ্য তথ্য নিরাপত্তা আধিকারিকদের তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে নীতি-নির্দেশিকা জারি। (৬) নিয়মিতভাবে সরকারি ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্সগুলির নিরীক্ষার সংস্থান। (৭) তথ্য সুরক্ষা রূপায়ণে নিরাপত্তা নিরীক্ষা সংস্থাগুলির তালিকাভুক্তিকরণ। (৮) সাইবার হামলা এবং সাইবার সন্ত্রাসের মোকাবিলায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা তৈরি। (৯) নিয়মিতভাবে সাইবার নিরাপত্তার মহড়া ও অনুশীলন এবং সরকারি সংস্থাগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা। (১০) নেটওয়ার্ক বা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং মুখ্য তথ্য নিরাপত্তা আধিকারিকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি।

যৌন হেনস্থার শিকার শিশুদের জন্য পকসো আইনে সংশোধন : স্মৃতি ইরানি



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যৌন হেনস্থা থেকে শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত পকসো সংশোধনী বিল, ২০১৯ সংসদে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট শিশু সুরক্ষা পরিষেবা কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অনুদান হিসেবে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। আর্ত শিশু-সহ যৌন হেনস্থার শিকার শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত পরিচর্যার জন্য কেন্দ্র এই আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি জুবিন ইরানি। তিনি আরও জানান, ২০১৬-১৭-তে ভিক্টিম কম্পেনসেশন তহবিলের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য এককালীন ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে তিনি আরও জানান, শিশু সুরক্ষা পরিষেবা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গকে ৬ হাজার ৭৬৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই টাকার মধ্যে ৩ হাজার ৫২২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। পরবর্তী দুটি আর্থিক বছরে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গকে যথাক্রমে ৫ হাজার ৭৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং ২ হাজার ৩৭২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আলোচ্য দুটি বর্ষে প্রদেয় অর্থের মধ্যে রাজ্য খরচ করেছে যথাক্রমে ৪ হাজার ২৩২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং ৩ হাজার ৩৯১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা।

সরকারের প্রথম পঞ্চাশ দিনের রিপোর্ট কার্ড পেশ করলেন প্রকাশ জাভড়েকর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম ৫০ দিনের কাজকর্মের রিপোর্ট কার্ড পেশ করেন। নতুন দিল্লিতে গত ২১ জুলাই রিপোর্ট কার্ড পেশ করে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি বলেন, সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদকালের শুরু থেকেই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' লক্ষ্যপূরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সংস্কার, জনকল্যাণ ও সুবিচারের দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কৃষক, সৈনিক, যুব-সম্প্রদায়, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, গবেষক, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো গঠন, দুর্নীতিরোধ ও সামাজিক ন্যায়ের মতো বিষয়গুলির ওপর সরকার বিশেষভাবে জোর দিয়েছে বলে শ্রী জাভড়েকর উল্লেখ করেন।

সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা মন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেন। এখন থেকে প্রত্যেক কৃষককে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। বহু কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এই মূল্য ২০১৪-র তুলনায় তিনগুণ করা হয়েছে। ১০ হাজারটি কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠন করা হচ্ছে। শ্রম আইনে পরিবর্তনের ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৪০ কোটি শ্রমিক বেতন ও শ্রম সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন। এই প্রথমবার, ব্যবসায়ীদের পেনশন দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ইএসআই-তে জমার হার, কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা দুপক্ষের জন্যই কমানো হয়েছে।

দেশে বিনিয়োগ টানার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির কথা মন্ত্রী উল্লেখ করেন। সরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে ৭০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত একটি ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির জন্য একটি বিশেষ টিভি চ্যানেল শীঘ্রই চালু করা হবে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর আধিকারিকদের নন-ফাংশনাল ফিনানসিয়াল আপগ্রেডেশন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন আগামী ৫ বছরে, পরিকাঠামো গঠনের জন্য ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। জলশক্তি মন্ত্রালয় স্থাপনের মাধ্যমে সরকার জল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ রুখতে সরকার যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে, তার সাফল্যের কথাও মন্ত্রী তুলে ধরেন। বিমস্টেক ও জি-২০-র মাধ্যমে ভারত বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা সফরের গুরুত্বও তিনি উল্লেখ করেন।

চন্দ্রযান-২ এর সাফল্যমণ্ডিত উত্থান সম্বন্ধে শ্রী জাভড়েকর আস্থা প্রকাশ করে জানান যে ২০২২ সালে ভারতীয় নভোচরদের নিয়ে গগনযান মহাকাশ অভিযানে পাড়ি দেবে।

আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তিনি উল্লেখ করেন। আর্থিক অপরাধীদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিল আনা হবে বলেও তিনি জানান।

পকসো আইনে সংশোধনের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকার বদ্ধপরিকর বলে শ্রী জাভড়েকর জানান। দেশের চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন ও এক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে, মন্ত্রী তারও উল্লেখ করেন।

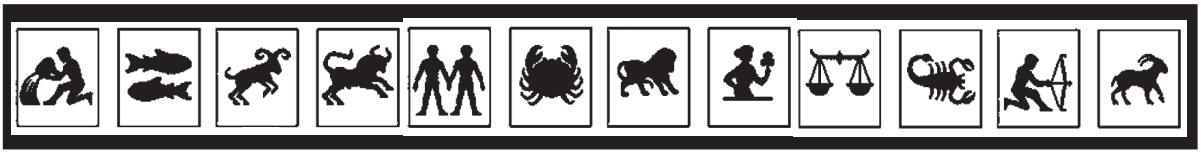
ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলা কেবল একটি স্বপ্নই নয় বলে মন্ত্রী জানান। সরকারের প্রথম ৫০ দিনের মধ্যে এই লক্ষ্যপূরণের জন্য রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে বলেও শ্রী জাভড়েকর জানান।

রাজ্যসভায় সর্বসম্মতভাবে পাশ আই এন এ (সংশোধনী) বিল, ২০১৯



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্যসভায় সর্বসম্মতভাবে পাশ হলো জাতীয় তদন্ত সংস্থা (সংশোধনী) বিল, ২০১৯। দুটি কক্ষেই একসঙ্গে পাশ হওয়ায় এখন থেকে এন আই এ কোনো ভারতীয় বা বিদেশে ভারতের স্বার্থ জড়িত এমন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের ঘটনার তদন্ত করার ক্ষমতা পাবে। এন আই এ সংশোধনী বিল নিয়ে রাজ্যসভায় সাংসদদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এটা সংসদের দায়িত্ব বিশ্বের সামনে এন আই এ-র একটি দৃঢ় ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে এন আই এ-কে ছোটো করা উচিত নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর ৩০ জুন পর্যন্ত ২,০৭২টি দায়ের করা মামলার মধ্যে ১৯৯টি আরোপপত্র দায়ের করা হয়েছে। ৫১টি মামলায় সাজা হয়েছে ও ৪৬টি মামলায় দণ্ড হয়েছে। তদন্ত সংস্থার স্বাধীনতার পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে তদন্ত এবং মামলা স্বাধীনভাবেই সম্পাদন হয়। কখনই তার অপব্যবহার হয় না। তাদের কাজকর্ম রাজনৈতিক মতের ওপর নির্ভর করে না, করে আইনের ওপর। সভাকে এই বলে শ্রী শাহ আশ্বস্ত করেন যে, এই সরকারের আমলে কোনো সংস্থারই অপব্যবহার করা হয়নি।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



২৯ জুলাই (সোমবার) থেকে ৪ আগস্ট (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, কর্কটে রবি-মঙ্গল-বক্রী বুধ, শুক্র, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি। ধনুতে বক্রী শনি-কেতু। পুনরায় ৩১ জুলাই বুধবার, রাত্রি ৩টে ১৪ মিনিটে বক্রী বুধের মিথুনে প্রত্যাগমন। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে মৃগরাশিরা নক্ষত্র থেকে সিংহে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে।

মেষ : শরীর, মন, বুদ্ধি নানারকম জ্ঞান আহরণ, কর্মদক্ষতা, বিদেশ যাত্রা, অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় ব্যাপৃত থাকবে। নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রদর্শনে বিদ্যার্থীর অনুকূল সময়। গৃহ ও বাহন যোগ। সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতিষ্ঠা। মৎস, চর্ম, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, ধূপকাঠি ব্যবসায় ইতিবাচক লাভ। ঈর্ষাকাতর সহকর্মী ও মান-সম্মান বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

বৃষ : বিদ্যায়, জ্ঞানার্জনে মেধার বিকাশ, কর্মকুশলতায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর, গৃহে গীত-উৎসব, আত্মীয় সমাগম, পুত্র-কন্যার সৌন্দর্য ও শিল্পনিপুণতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ফলবতী হবে। শ্রী-ঐশ্বর্য, গুণীজন সহায়তায় বৈভব, হৃত আধিপত্য পুনরুদ্ধার। একাধিক উপায়ে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হলেও শারীরিক অসুস্থতায় ভারাক্রান্ত মন, অতৃপ্তভাব ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেবে।

মিথুন : ব্যক্তিত্বে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক অনুধাবনে নিজ বিচার ধারায় প্রতিকূল অবস্থা থেকে বিদ্যায়, জ্ঞানার্জনে, পাণ্ডিত্য প্রভাবে মোহাবিষ্ট সুললিত ভাষণে ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। রমণীর স্নেহ-সুধায় সন্তানের দরকারি কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত, সমালোচনা ও অমিতব্যয়িতার যোগ বর্তমান।

কর্কট : চিন্তায় দোদুল্যমানতা, অসৎসংসর্গে নেশায় আকর্ষণ, জ্ঞাতি বিদ্বেদ, স্থানান্তর ও কর্মক্ষেত্রে চঞ্চল মনসিকতায় ভুল-ভ্রান্তি, বিড়ম্বনা, নিকটজনের মন্দ ব্যবহার। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তি ও রমণীর বুদ্ধিমত্তায় সাংসারিক সুস্থিতি। সপ্তাহের শেষাংশে সততা-সরলতায় অসমাপ্ত কর্ম সমাপন। স্বজন সম্পর্কের উন্নতি হলেও মাতার স্বাস্থ্যহানি উদ্বেগের বিষয়।

সিংহ : দোদুল্যমানতা, কৌশলী মন-মানসিকতা, আইনি জটিলতা। সহকর্মী বিরোধিতায় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ণে বিঘ্ন। কারও প্ররোচনায় আর্থিক লেনদেন বিষয়ে সতর্ক থাকুন। বয়স্ক মিত্র শুভ নয়। রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দের দুশ্চিন্তা, ব্যবস্থা ও চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। পরোপকারের সার্থক প্রচেষ্টায় অবিবাহিতদের বিবাহ যোগ।

কন্যা : মন-মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ, বিলাস-ব্যসন, সুখাদ্য ভোজনে আনন্দঘন পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও দক্ষতার মেলবন্ধনে সফল্য ও কর্তৃপক্ষের শংসা প্রাপ্তি। শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, অনুবাদক, প্রকশক, কবি, লেখকের সৃজনী শক্তির মৌলিকতায় প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ হবে।

তুলা : নিজ শরীর পরিবারিক সুস্থিতি, অকারণ ঝামেলা বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পেশাদারদের রোজগার কর্মপ্রার্থীদের আশাব্যঞ্জক সংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবন। প্রমোটিং, দলালি, ইমারতি ও নির্মাণ শিল্পে দিগন্তের নতুন দিশা ও সমৃদ্ধি। ভুল বোঝাবুঝি, সমালোচনা ছায়াসঙ্গী।

বৃশ্চিক : পুত্র-কন্যার উচ্চশিক্ষা, প্রতিযেগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য ও সুকীর্তি। গুরুজনে শ্রদ্ধা-ভক্তি, সরলতা, সততা ও মননশীলতা, সংস্কৃতি চর্চায় উৎফুল্ল মন ও কথাবার্তায় আনন্দময়তার প্রকাশ। ব্যয়বাহুল্য ও শারীরিক অসুস্থতায় চলার স্বাভাবিক ছন্দে বিঘ্ন। ভালো সুহৃদ সম্পর্কে মানসিক প্রশান্তি।

ধনু : জাতক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিত্তবান, তেজস্বী, বিলাসব্যসন প্রিয় সর্বোপরি বিপথে চালিত হবার প্রবণতা বর্তমান। শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাস্কর্যের পূজারিদের শিল্প নিপুণতা, সৃষ্টিশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিতে প্রতিভার স্বীকৃতি, যশ, সম্মান পুরো সমাজ তার স্বাদ পাবে। স্বজনবান্ধব-সহ দূর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের সম্ভাবনা। আচমকা চোট-আঘাত ও ব্যয়াধিক্যের যোগ।

মকর : গুরুজন দেবদ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধা, নির্ভীক কর্তব্যপরায়ণ, ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে বিকশিত অন্তর। সমাজ প্রগতিমূলক কাজ ও দুর্বল শ্রেণীর সহয়তায় সফল মনস্কাম। সন্তানের আধুনিকতার পরশে মনঃসংযোগের অভাবে উচ্চশিক্ষায় বাধা। কর্মক্ষেত্রে রমণীর সৌন্দর্য সুধায় বিহ্বল চিত্ত।

কুম্ভ : সহোদরের ভাগ্যোন্নতি, স্ত্রীর বুদ্ধি কুশলতায় পারিবারিক সুস্থিতি ও সমৃদ্ধি। সন্তানসন্ততির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য ও পুত্রকল্যাণে বৈভব বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম, প্রসাধনী, ওষুধ, পুস্তক, ছাপাখানা ও রঙের ব্যবসায় বিনিয়োগ, প্রসার ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। বিলাসপ্রিয়তা, বিদ্রূপ, বিরক্তিকর পরিবেশ এড়িয়ে চলুন।

মীন : নতুন চিন্তা, চেতনায় একাধিক কর্মপ্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ ও মানব বেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, মাতৃসুখ। নিকট প্রতিবেশীর মন্দ ব্যবহারে মানসিক ক্লেশ। বেকারদের চলমান সপ্তাহে শুভ সংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিনিয়োগ, লিখিত চুক্তি, স্পষ্টবাদিতা পরিহার শ্রেয়। আর্থিক শুভ।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,

DEUTZ, A. G., GERMANY

LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY

With Best Compliments from -

A Well Wisher

GS

With best compliments from :

JAI BHARAT COMMERCIAL CORPORATION

23/24, Radha Bazar Street

3rd Floor, Kolkata- 700 001

Phone : 2242-5889 / 7995

Email : jbccsonthalia@yahoo.com

&

jbccsonthalia@gmail.com